তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

একাদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

১৮০৮ শক

কলিকাতা
আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৩। কলিগতাব্দ ৪৯৮৭। ১ চৈত্র।

মূল্য ৪ চারি টাকা মাত্র।

বৈশাখ ৫১৩ সংখ্যা।

আচার্য্যের উপদেশ ১
কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব ৩
ধর্ম্মপ্রচারক ও মহাত্মা রামমোহন রায় ৯
ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-নীতি ১২
সত্য ১৪
নব-বর্ষের গান ২০

জ্যৈষ্ঠ ৫১৪ সংখ্যা।

বর্ষ-শেষ ব্রাহ্মসমাজ ২১
নব-বর্ষ ২৪
দর্শন-সংহিতা ২৫
চরিত্র ৩৩
শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ব্যাখ্যাত ৩৬
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি ৪০

আষাঢ় ৫১৫ সংখ্যা।

আচার্য্যের উপদেশ ৪১
দর্শন-সংহিতা ৪৫
আধ্যাত্মিক রূপক ৫৩
প্রেরিত পত্র ৫৭
ব্যাখ্যান-মঞ্জরী ৫৯

শ্রাবণ ৫১৬ সংখ্যা।

ভবানীপুর চতুস্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ৬১
দর্শন-সংহিতা ৬৩
স্বর্গ ও নরক ৭২
দেব-পথ ৭৩
ব্রাহ্মসমাজ এবং ইহার অতীত ও বর্ত্তমান ৭৪
সত্য ৭৯
প্রাপ্তি স্বীকার ৭৯

ভাদ্র ৫১৭ সংখ্যা।

আচার্য্যের উপদেশ ৮১
দর্শন-সংহিতা ৮৪
ব্রাহ্মধর্ম্ম-নীতি ৯২
স্বাস্থ্য ও বৈবাহিক বয়স ৯৫
প্রাপ্তি স্বীকার ১০০

আশ্বিন ৫১৮ সংখ্যা।

আচার্য্যের উপদেশ ১০১
দর্শন-সংহিতা ১০৫
সমাজ সংস্কার ১১৪
ব্যাখ্যান-মঞ্জরী ১১[illegible]
সমালোচনা ১১৯
প্রাপ্তি স্বীকার ১১৯

কার্ত্তিক ৫১৯ সংখ্যা।

আচার্য্যের উপদেশ ১২১
দর্শন-সংহিতা ১২৪
ব্রাহ্মসমাজ ও অক্ষয়কুমার দত্ত ১৩৫
বালকের প্রার্থনা ১৪৩

অগ্রহায়ণ ৫২০ সংখ্যা।

শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব ১৪৫
দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব ১৪৮
মহদ্বাক্য ১৫৯

পৌষ ৫২১ সংখ্যা।

আচার্য্যের উপদেশ ১৬১
দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব ১৬৪
পত্র ১৬৯
বিবিধ ১৭২
মহদ্বাক্য ১৭৫
জ্যোতি ১৭৬
ব্যাখ্যান-মঞ্জরী ১৭৭

মাঘ ৫২২ সংখ্যা।

আচার্য্যের উপদেশ ১৮১
ধর্ম্মের নিয়ম ১৮৪

ফাল্গুন ৫২৩ সংখ্যা।

আচার্য্যের উপদেশ ২০৫
সপ্তপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ২০৭

চৈত্র ৫২৪ সংখ্যা।

অভিনন্দন পত্র
উপহার
প্রশ্নোত্তর
সংশয়বাদের পরিণাম
মহদ্বাক্য

অকারাদি বর্ণক্রমে একাদশ কল্পের চতুর্থ ভাগের সূচীপত্র

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
অভিনন্দন পত্র	৫২৪	২২১
আচার্য্যের উপদেশ	৫১৩	১
আচার্য্যের উপদেশ	৫১৫	৪১
আচার্য্যের উপদেশ	৫১৭	৮১
আচার্য্যের উপদেশ	৫১৮	১০১
আচার্য্যের উপদেশ	৫১৯	১২১
আচার্য্যের উপদেশ	৫২১	১৬১
আচার্য্যের উপদেশ	৫২২	১৮১
আচার্য্যের উপদেশ	৫২৩	২০৫
আধ্যাত্মিক রূপক	৫১৫	৫৩
উপহার	৫২৪	২২৫
কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব	৫১৩	৩
চরিত্র	৫১৪	৩৩
জ্যোতি	৫২১	১৭৬
দর্শন-সংহিতা	৫১৪	২৫
দর্শন-সংহিতা	৫১৫	৪৫
দর্শন-সংহিতা	৫১৬	৬৩
দর্শন-সংহিতা	৫১৭	৮৪
দর্শন-সংহিতা	৫১৮	১০৫
দর্শন-সংহিতা	৫১৯	১২৪
দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব	৫২০	১৪৮
দর্শন-সংহিতা—জ্ঞানতত্ত্ব	৫২১	১৬৪
দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি	৫১৪	৪০
দেব-পথ	৫১৬	৭৩
ধর্ম্মপ্রচারক ও মহাত্মা রামমোহন রায়	৫১৩	৯
ধর্ম্মের নিয়ম	৫২২	১৮৪
ব-বর্ষ	৫১৪	২৪
বর্ষের গান	৫১৩	২০
	৫২১	১৬৯
ব্বর	৫২৪	২৩৩
স্বীকার	৫১৬	৭৯

	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
প্রাপ্তি স্বীকার	৫১৭	১০০
প্রাপ্তি স্বীকার	৫১৮	১১৯
প্রেরিত পত্র	৫১৫	৫৭
বর্ষ-শেষ ব্রাহ্মসমাজ	৫১৪	২১
বালকের প্রার্থনা	৫১৯	১৪৩
বিবিধ	৫২১	১৭২
ব্যাখ্যান-মঞ্জরী	৫১৫	৫৯
ব্যাখ্যান-মঞ্জরী	৫১৮	১১৭
ব্যাখ্যান-মঞ্জরী	৫২১	১৭৭
ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-নীতি	৫১৩	১২
ব্রাহ্মধর্ম্ম-নীতি	৫১৭	৯২
ব্রাহ্মসমাজ এবং ইহার অতীত ও বর্ত্তমান	৫১৬	৭৪
ব্রাহ্মসমাজ ও অক্ষয়কুমার দত্ত	৫১৯	১৩৫
ভবানীপুর চতুস্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৫১৬	৬১
মহদ্বাক্য	৫২০	১৫৯
মহদ্বাক্য	৫২১	১৭৫
মহদ্বাক্য	৫২৪	২৩৬
শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ব্যাখ্যাত	৫১৪	৩৬
শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব	৫২০	১৪৫
সত্য	৫১৩	১৪
সত্য	৫১৬	৭৯
সপ্তপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৫২৩	২০৭
সমাজ সংস্কার	৫১৮	১১৪
সমালোচনা	৫১৮	১১৯
সংশয়বাদের পরিণাম	৫২৪	২৩১
স্বর্গ ও নরক	৫১৬	৭২
স্বাস্থ্য ও বৈবাহিক বয়স	৫১৭	৯৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

২ চৈত্র রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৬।

আচার্য্যের উপদেশ।

বর্ত্তমান বৎসর পূর্ব্ব বৎসর হইতে আসিয়াছে এবং আগামী বৎসরের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে; কিন্তু আমরা কোথা হইতে আইলাম, কোথায় রহিয়াছি, কোথায় যাইতেছি? ইহার সহজ উত্তর এই—সত্য উত্তর এই যে, ঈশ্বর হইতে আমরা আসিয়াছি—ঈশ্বরেতে অবস্থিতি করিতেছি, ঈশ্বরাভিমুখে যাইতেছি। ইহার কুটিল উত্তর এই—বিভ্রান্ত উত্তর এই যে, নানা কার্য্য-কারণ হইতে আসিয়াছি—নানা কার্য্য-কারণের আবর্ত্তে রহিয়াছি—কোথায় যাইতেছি তাহার ঠিকানা নাই। আমরা কি বস্তু তাহা যদি আমরা স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা কোথা হইতে আইলাম তাহা নিশ্চিত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি; এ রহস্যের চাবি আমাদের নিজের হস্তে রহিয়াছে, তথাপি তাহার অন্বেষণে আমরা সারা রাজ্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা হইতেছি। আমরা বেস্ জানিতেছি যে, আমাদের সঙ্গে আর আর বস্তুর সঙ্গে এক দিকে যেমন সমস্তই মেলে, আর এক দিকে তেমনি কিছুই মেলে না; অন্যান্য বস্তুর ন্যায় আমরাও কার্য্য-কারণশৃঙ্খলে আবদ্ধ—কিন্তু এটা কেবল বাহিরে বাহিরে; ভিতরে ভিতরে আমরা কার্য্য-কারণশৃঙ্খলের কোন ধারই ধারি না—আমরা স্বাধীন। আত্মার স্বাধীনতা যে কি তাহা তর্ক করিয়া বুঝিবার জো নাই—তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়। আমাদের অভ্যন্তরে এমন একটি স্থান আছে যেখানে ক্ষুধা নাই—তৃষ্ণা নাই—নিদ্রা নাই—তন্দ্রা নাই—জরা নাই—রোগ নাই, কেবল এক স্বাধীনতা পক্ষ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে,—সে স্থানটিকে বাহিরে উল্টাইয়া দেখানো যায় না—ভিতরে প্রণিধান করিয়া দেখিতে হয়। এ স্বাধীনতা জগতের নহে—সুতরাং ইহা জগৎ হইতে আসিতে পারে না,—এ স্বাধীনতা জগতের পরপারের বস্তু,—জগতে কেমন করিয়া প্রবেশ করিল ইহাই আশ্চর্য্য। জগতের সকল বস্তুই সকল বস্তুকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—এবং সেই বন্ধনের বলই জগতের গুরুত্ব। পৃথিবী যাহাকে অধিক টানে তাহাই অধিক ভারী,—

যাহাকে কেহই আকর্ষণ করে না তাহা একেবারেই বীতভার—একবারেই বন্ধন-রহিত—একবারেই মুক্ত। সমস্ত জগৎকে যদি একটি জড়পিণ্ড বলিয়া ভাবা যায়, তবে তাহাকে কে আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া আছে ? চন্দ্রকে পৃথিবী আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া আছে, পৃথিবীকে সূর্য্য আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া আছে, কিন্তু সমস্ত জগতের বাহিরে আর কোন জাগতিক বস্তু নাই—যে তাহাকে বাহির হইতে আকর্ষণ করিবে সে নাই—সমস্ত জগৎ একেবারেই বন্ধন-রহিত—বীত-ভার—মুক্ত। জগতের ভিতরকার সকল বস্তুই বদ্ধ—কেননা সকল বস্তুই আর-সকল বস্তুর আকর্ষণে বিধৃত রহিয়াছে,—কিন্তু জগতের মূলে বন্ধনের থাকিবার স্থান নাই ; সেখানে মুক্তি সম্মুখে—মুক্তি পশ্চাতে—মুক্তি দক্ষিণে—মুক্তি উত্তরে—সেখানে নিখিল আকাশ ভরিয়া মুক্তির ওঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পরমাত্মা সেই মুক্তিতে বিরাজ করিতেছেন ; —কিন্তু কি আশ্চর্য্য—এখানকার এই স্নাতক্কের বন্ধনের মধ্যেও আমরা সেই মুক্তির আভাস দেখিতে পাইতেছি—আত্মার স্বাধীনতা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি ! এই ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য-দেহ যাহা আজ আছে কাল নাই— ইহার অভ্যান্তরে স্বাধীনতা নীরবে আসিয়া আসন পাতিয়া বসিয়াছে। কার্য্য-কারণের ঘূর্ণা আবর্ত্ত প্রবল বেগে বহিতেছে—সেই ঘূর্ণার নাভি-কেন্দ্রে স্বাধীনতা অটল পদ্মাসনে অবিচলিত রহিয়াছে। আত্মার এই যে স্বাধীনতা ইহা জগতের মূলস্থিত নিরালম্ব মুক্ত ভাবেরই প্রতিকৃতি—জগতের অভ্যান্তরে কেমন করিয়া প্রবেশ করিল ইহাই আশ্চর্য্য। আমাদের আত্মা যে কি বস্তু তাহা যদি আমরা তন্মন ভাবে চিন্তা করিয়া দেখি—পুস্তকে কে কি বলিয়াছে সে সকল কথা দূরে রাখিয়া আপনার আত্মাকে আপনি একবার ভাল করিয়া ঠাহরিয়া দেখি—তাহা হইলে কোথা হইতে আমরা আসিয়াছি তাহা বুঝিতে আমাদের একদণ্ডও বিলম্ব হইবে না, রত্নটিকে চিনিতে পারিলে কোন্ আকর হইতে তাহা আসিয়াছে তাহা জানিতে অবশিষ্ট থাকিবে না। আমাদের আত্মার মধ্যে আমরা এরূপ এক আশ্চর্য্য স্বাধীন ভাব দেখিতে পাই যে, তাহা জগতের মূল-প্রদেশেই সম্যক্ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে—জগতের ভিতরে তাহার স্থান-সঙ্কুলন হয় না। কৃষকের ঘরের বালক—কিন্তু তাহার ললাটে রাজ-টীকা—ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, বাস্তবিক সে কৃষক-পুত্র নহে কিন্তু রাজপুত্র,—পরাধীন মর্ত্ত্য শরীরের অভ্যন্তরে স্বাধীন অবিনশ্বর আত্মা—ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে এ আত্মা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপেরই পুত্র। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পরমাত্মা প্রকৃতির মধ্য-স্থলে মুক্তি-আসনে আসীন হইয়া প্রকৃতিকে কিরূপ নিরুদ্বেগে—নিরাকুল ভাবে—অতন্দ্রিত ভাবে চালনা করিতেছেন—তাঁহার সেই কার্য্য দেখিয়া আমরা যদি কার্য্য-শিক্ষা করি, তবে আমরা কত না কাজের লোক হইতে পারি। তাঁহার সেই দূরাৎ-সুদূরদর্শী গভীর জ্ঞানের সুধীর কার্য্যের তুলনায় আমাদের অস্থির বুদ্ধির কার্য্য সকল—যাহা লইয়া আমরা এত গৌরবান্বিত হই—তাহা একবারেই কিছুই নহে। অনন্ত আকাশ যাঁহার কার্য্যের পরিধি এবং অনন্তকাল যাঁহার কার্য্যের প্রবাহ, তাঁহার কর্য্যের সম্যক তাৎপর্য্য বুঝিয়া ওঠা কোন সৃষ্ট-জীবেরই সধ্যায়ত্ত নহে। তাঁহার কার্য্যের কণামাত্র মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলেই আমরা কৃত-কৃতার্থ হই। আমরা যে যাহা শিখিয়াছি ও শিখিতেছি সকলই তাঁহারই দেখিয়া শেখা। কিন্তু আমরা অল্প শিখিয়াই মনে করি যে, আর আমাদের শিখিবার

প্রয়োজন নাই, গুরুর গুরু হইতে পৃথক্ হইয়া আমরা আমাদের আপনাদেরই গুরুত্ব সমর্থন করিতে সচেষ্ট হই,—ইহাতেই আমাদের সমস্ত কার্য্য ভণ্ডুল হইয়া যায়। আমরা যদি ঈশ্বরের গভীর জ্ঞান-সঙ্গত ধীর-গম্ভীর কার্য্যের সহিত আমাদের কার্য্যকে একতানে মিলিত করিতে পারি—তাহা হইলে আমাদিগকে কিছুরই জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইতে হয় না—কিছুরই জন্য উদ্বেগ পাইতে হয় না—অথচ আমাদের কার্য্য সাফল্যের দিকে প্রতি মুহূর্ত্তেই অগ্রসর হইতে থাকে—আমাদের স্বাধীনতা নিয়তই জাগ্রত থাকে—এবং তাহা হইতে নিয়তই বিমল আনন্দধারা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে; তাহা হইলে আমরা যাঁহা হইতে আসিয়াছি তাঁহাতেই অবস্থিত থাকিয়া তাঁহারই অভিমুখে আনন্দের সহিত প্রত্যুদ্গমন করিতে থাকি। তখনই আমরা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি—ঈশ্বরেতে অবস্থিতি করিতেছি এবং ঈশ্বরের অভিমুখে নিয়ত অগ্রসর হইতেছি।

হে পরমাত্মন্! তুমি যখন আমাদিগকে স্বাধীন আত্মা দিয়াছ তখন সকলই দিয়াছ তুমি আপনাকে দিয়াছ,—প্রকৃতি আমাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু আমাদের স্বাধীন আত্মা তোমার নিকটে যাইয়া তোমার মুখ-জ্যোতির আনন্দ রস পান করিতে চায়—তোমার কার্য্যে কার্য্য মিসাইয়া মুক্তির অসীম সাগরে সন্তরণ করিতে চায়। তুমি আমাদের আত্মার মোহাবরণ মুক্ত করিয়া তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর—তাহা হইলেই আমাদের পথ আমরা দেখিতে পাইব,—তাহা হইলেই আমরা তোমার ক্রোড়ে গিয়া সমস্ত পাপ দুঃখ শোক অমৃত সাগরে বিসর্জ্জন দিব। তখন, যাহাতে আমরা তোমার কার্য্যে যোগ দিতে পারি তুমি আমাদের হস্ত ধারণ করিয়া তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিবে,—তখন তোমার জ্ঞান তোমার প্রেম তোমার কার্য্য দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া তাহাতেই নিমগ্ন থাকিব—আর কোন দিকে চক্ষু ফিরাইতে আমাদের প্রবৃত্তি হইবে না; এখন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া—দূর হইতে তাহার সমাচার পাইয়া—তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব।

কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব লইয়া ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে যেরূপ বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে তাহার একটা চুম্বক ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রদর্শন করিয়াছি*; এবং তাহার সার মন্থন করিয়া আমরা এই দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, (১) যখন যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন না কোন কারণ-কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া ঘটে—জ্ঞান-মাত্রেরই ইহা একটি ধ্রুব প্রত্যয়; (২) আরো এই যে, কারণের অস্তিত্বে জ্ঞানের ঐ যে, প্রত্যয়, উহাকে উত্তরোত্তর দৃঢ় করিবার জন্য উত্তরোত্তর নানা ঘটনার পরীক্ষা আবশ্যক হয় না,—উহা আপনিই আপনার প্রমাণ—উহা স্বতঃসিদ্ধ। কার্য্য কারণের মূলতত্ত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে—এক্ষণে তাহার প্রয়োগসম্বন্ধে গুটি দুই কথা আমাদের বলিবার আছে,—নিম্নে তাহা খুলিতেছি।

প্রথমে, বাহিরের ঘটনা আমাদের সম্মুখে যখন যেমন উপস্থিত হয়, তদ্রূপ-

---

* বিগত পৌষ মাসের পত্রিকা দেখ।

লক্ষেই আমরা কার্য্য-কারণ-তত্ত্বের প্রয়োগ করিয়া থাকি; কিন্তু আমরা যতদূর প্রয়োগ করিতে চাই—ফলে ততদূর পারিয়া উঠি না—অনেকটা আমাদের হাতে বাকি থাকিয়া যায়। যখন আমরা দেখি একখণ্ড দগ্ধ কাষ্ঠ পড়িয়া আছে তখনই আমরা মনে করি যে, অগ্নির দাহিকা-শক্তির প্রভাবেই কাষ্ঠের এইরূপ ভাব-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—অগ্নিতে আমরা দাহন-কার্য্যের কারণত্ব আরোপ করি; কিন্তু তাহা করিয়াই আমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। অগ্নি যে দাহন করে—তাহা কেন করে? কাহার শক্তি তাহাকে দাহন-কার্য্যে প্রবৃত্ত করে? আবার অগ্নিকে যে দাহন-কার্য্যে প্রবৃত্ত করে,—সে-ই বা কে? এবং তাহার সেই প্রবর্ত্তনা-কার্য্যেরই বা কারণ কি? এইরূপ ক্রমাগতই কারণের পৃষ্ঠে কারণ লাগিয়া আছে, কোথাও তাহার অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনেক দার্শনিক পণ্ডিত আরোহী প্রণালী-অনুসারে কারণের মূল-আবিষ্কারে পরাভব মানিয়া শেষে এইরূপ এক অযথা সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া বসেন যে, কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব নিতান্তই বুদ্ধির অতীত—উহার আলোচনায় ক্ষান্ত থাকাই শ্রেয়। যদি আরোহী প্রণালী ভিন্ন আর কোন প্রকার যুক্তি-প্রণালী না থাকিত তবে ইহাঁদের কথা অকাট্য হইত; কিন্তু নিম্নে আমরা দেখাইব যে, একরূপ যুক্তি প্রণালীতে যে প্রশ্নের কিছুই মীমাংসা হয় না, আর একরূপ যুক্তি-প্রণালীতে তাহার মীমাংসা অতীব সহজে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

প্রমাণের বিষয় যেমন নানা প্রকার, প্রমাণের পদ্ধতিও সেইরূপ নানা প্রকার; কোন পদ্ধতি কোন বিষয়ে খাটে—কোন বিষয়ে খাটে না। অতি-একটি সহজ বিষয়কেও যদি অনুপযুক্ত পদ্ধতি দ্বারা আয়ত্ত করিতে যাও—দেখিবে যে, তাহা কিছুতেই তোমাকে ধরা দিবে না। নিম্নে ইহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

ক খ

মনে কর ক দুই হাত পিছাইয়া আছে, খ দুই হাত এগিয়া আছে; আর মনে কর যে, ক যদিও দুই হাত পিছাইয়া আছে, তথাপি তাহা খ অপেক্ষা দ্বিগুণ বেগে চলে; ক এক নিমেষে দুই হাত অতিবাহন করে, খ এক নিমেষে এক হাত মাত্র অতিবাহন করে। মনে কর, ক এবং খ উভয়েই চলিতে আরম্ভ করিল; খ একগুণ বেগে চলিতেছে—ক দ্বিগুণ বেগে চলিতেছে; এস্থলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে কিয়ৎকাল পরেই ক, খ'কে ধরিতে পারিবে,—এবং তাহার পরেই খ'কে পশ্চাতে ফেলিয়া এগিয়া যাইবে; কিন্তু আমি আমার যুক্তি-প্রণালী অনুসারে প্রমাণ করিব যে, ক কখনই খ'কে ধরিতে পারিবে না। সে প্রণালী এইরূপ;—

ক খ গ ঘ

মনে কর, ক-স্থান হইতে ক এবং খ-স্থান হইতে খ একই সময়ে চলিতে আরম্ভ করিল, এবং উভয়ের মধ্যে দুই হাত মাত্র ব্যবধান; ক সেই দুই হাত ব্যবধান অতিক্রম করিয়া যখন ক-স্থান হইতে খ-স্থানে উপনীত হইল, খ তখন চুপ করিয়া বসিয়া নাই,—ক যেমন দুই হাত অতিক্রম করিয়া খ-স্থানে উপনীত হইল, খ তেমনি এক হাত অতিক্রম করিয়া গ-স্থানে উপনীত হইল, কেননা খ'য়ের গতি-বেগ ক-অপেক্ষা অর্দ্ধেক কম। এইরূপ ক যখন খ'য়ের প্রথম স্থানে—অর্থাৎ খ-স্থানে—আসিবে, খ তখন তাহার সেই প্রথম স্থান হইতে এক হাত দূরে দ্বিতীয়-স্থানে (অর্থাৎ গ-স্থানে) যাইবে; তাহার পর, ক যখন সেই এক হাত অতিক্রম করিয়া খ'য়ের দ্বিতীয় স্থানে (গ-স্থানে) যাইবে, খ তখন আধ হাত অতিক্রম করিয়া তৃতীয়

স্থানে (অর্থাৎ গ-স্থান হইতে ঘ-স্থানে) যাইবে; তাহার পর ক যখন সেই আধ হাত অতিক্রম করিয়া খ'য়ের তৃতীয় স্থানে (ঘ স্থানে) যাইবে, খ তখন সিকি হাত অতিক্রম করিয়া চতুর্থ স্থানে যাইবে; ক যখন সেই সিকি হাত অতিক্রম করিয়া খ'য়ের চতুর্থ স্থানে যাইবে, খ তখন অর্দ্ধ সিকি হাত অতিক্রম করিয়া পঞ্চম স্থানে যাইবে; ক যখন সেই অর্দ্ধ সিকি হাত অতিক্রম করিয়া খ'য়ের পঞ্চম স্থানে যাইবে, খ তখন সিকির সিকি হাত অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ স্থানে যাইবে; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ক এবং খ'য়ের মধ্যে প্রথমে দুই হাত ব্যবধান ছিল; ক যখন খ'য়ের পরিত্যক্ত খ-স্থানে আসিল, তখন উভয়ের মধ্যে এক হস্ত ব্যবধান রহিল; ক যখন খ'য়ের পরিত্যক্ত গ-স্থানে আসিল, তখন উভয়ের মধ্যে অর্দ্ধ হস্ত ব্যবধান রহিল; ক যখন খ'য়ের পরিত্যক্ত ঘ-স্থানে আসিল তখন উভয়ের মধ্যে সিকি হস্ত ব্যবধান রহিল; ক যখন খ'য়ের চতুর্থ স্থানে আসিল উভয়ের মধ্যে তখন অর্দ্ধ সিকি হাত ব্যবধান রহিল; ক যখন খ'য়ের পঞ্চম স্থানে আসিল, উভয়ের মধ্যে তখন সিকির সিকি হাত ব্যবধান রহিল; ক্রমাগতই এইরূপ পদ্ধতি অনুসারে উভয়ের মধ্যে অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করিয়া ব্যবধান কমিতে থাকিল—কিন্তু কোন কালেই ব্যবধান তিরোহিত হইল না। এক ব্যবধান আর-এক ব্যবধানের সিকির সিকির অর্দ্ধেক হইলেও তাহা ব্যবধান—সিকির সিকির সিকি হইলেও তাহা ব্যবধান, যতই অল্প ব্যবধান ভাবো না কেন তাহাও ব্যবধান তাহার আর ভুল নাই;—অতএব আমার যুক্তি প্রণালী অনুসারে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোন কালেই ক এবং খ উভয়ের মধ্যে ব্যবধান একেবারেই বিলুপ্ত হইবে না, খ একটু না একটু এগিয়া থাকিবেই থাকিবে; অতএব প্রমাণ হইল যে, ক—খ'কে কিছুতেই ধরিতে পারিবে না।

উপরে শুদ্ধ কেবল স্থানিক যুক্তি-প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে,—ক যখন খ'য়ের পরিত্যক্ত স্থানে পৌঁছিবে খ তখন সে স্থান হইতে একটু না একটু দূরে সরিয়া যাইবে —এইরূপ স্থান-ঘটিত প্রমাণ প্রয়োগ করা হইয়াছে; কিন্তু সেরূপ যুক্তি-প্রণালী এখানকার অনুপযোগী ইহা বলা বাহুল্য। কালিক যুক্তি-প্রণালীতে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, ক যখন এক নিমেষে দুই হাত অতিবাহন করে, তখন দুই নিমেষে ক-স্থান হইতে ৪হাত দূরে অগ্রসর হইবে, আর খ সেই দুই নিমেষে খ-স্থান হইতে দুই হাত (সুতরাং ক-স্থান হইতে ৪ হাত) দূরে অগ্রসর হইবে; দুই নিমেষে উভয়েই ক-স্থান হইতে ৪ হাত দূরে পৌঁছিবে; অতএব প্রমাণ হইল যে, দুই নিমেষে ক খ'কে ধরিবে।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে শুদ্ধ কেবল স্থানিক যুক্তি-প্রণালী দ্বারা যাহা কোন মতেই প্রমাণ-সাধ্য নহে, কালিক যুক্তি-প্রণালী দ্বারা তাহা অতি সহজে সপ্রমাণ হয়। এখন,মুল কারণের অস্তিত্ব-প্রমাণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদিও কারণের কারণ—তস্য কারণ—এরূপ করিয়া উপর্য্যুপরি উর্দ্ধে উড্ডয়ন করিতে থাকিলে কোন কালেই মুল কারণে পৌঁছান যায় না—যদিও কালিক যুক্তি-প্রণালী অনুসারে মুল-কারণের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারা যায় না—তথাপি আমরা আধ্যাত্মিক প্রণালী অনুসারে মুল-কারণের অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। উপরে আমরা দেখাইয়াছি যে, যাহা স্থানিক প্রমাণ-দ্বারা কোন মতেই সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা কালিক প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে; এক্ষণে আমরা দেখাইতে চাই যে, এমনও বিষয় আছে যাহা কালিক প্রমাণ

দ্বারা কোন মতেই সিদ্ধ হয় না, অথচ আধ্যাত্মিক প্রমাণ দ্বারা অনায়াসেই সিদ্ধ হয়।

দেশ-ঘটিত এমন কতক-গুলি তত্ত্ব আছে যাহা কাল-সম্বন্ধেও খাটে; আবার,দেশ-ঘটিত এমনও কতক-গুলি তত্ত্ব আছে যাহা কাল-সম্বন্ধে আদবেই খাটে না। মধ্য ভাগ অতিক্রম না করিয়া অন্ত-ভাগে পৌঁছানো যায় না—এ তত্ত্বটি দেশ কাল উভয়েতেই খাটে; যেমন বলা যাইতে পারে যে, দুই ক্রোশ অতিবাহন না করিয়া চারি ক্রোশে পৌঁছানো যায় না, তেমনি বলা যাইতে পারে যে, দুই ঘণ্টা অতিক্রম না করিয়া চারি ঘণ্টায় পৌঁছানো যায় না। কিন্তু যদি বলা যায় যে, অগ্র-পশ্চাৎ পরিবর্ত্তিত হইলেই পার্শ্ব পরিবর্ত্তিত হইবে, তবে এ তত্ত্বটি কেবল দেশের সম্বন্ধেই খাটে—কালের সম্বন্ধে খাটে না; দেশের সম্বন্ধেই বলিতে পারো যে, পূর্ব্ব-মুখা হইয়া দাঁড়াইলে শরীরের দক্ষিন পার্শ্ব দক্ষিন দিকে রহে, পশ্চিম-মুখা হইয়া দাঁড়াইলে সেই দক্ষিণ পার্শ্ব উত্তরদিকে ফিরিয়া যায়, অগ্রপশ্চাৎ পরিবর্ত্তিত হইলেই সেই সঙ্গে পার্শ্বও পরিবর্ত্তিত হয়। এ তত্ত্বটি কালের সম্বন্ধে এইজন্য খাটে না, যেহেতু কালের শুদ্ধ কেবল অগ্র পশ্চাৎ আছে—পার্শ্ব নাই। তেমনি আবার আত্মার একত্ব—যাহা একটি মাত্র বিন্দুর সহিত উপমেয়—তাহার পার্শ্বও নাই অগ্রপশ্চাৎও নাই,—এই জন্য "কালের উজান বাহিয়া মূল-কারণে উঠিতে হইবে" এ প্রণালীটি আধ্যাত্মিক পরম কারণ সম্বন্ধে খাটে না। বলিলাম যে, আত্মার একত্ব একটি মাত্র বিন্দুর সহিত উপমেয়, কিন্তু পরম-কারণ-সম্বন্ধে তাহাও সম্পূর্ণ রূপে ঠিক্ নহে,—আকাশ-স্থিত একটি বিন্দুর পার্শ্বে আর একটি বিন্দু কল্পিত হইতে পারে—কাল-স্থিত একটি মুহূর্ত্তের পুরোভাগে আর একটি মুহূর্ত্ত কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু পরম-কারণের একত্ব আকাশের সমস্ত বিন্দুকে এক মহাকাশের মধ্যে কবলিত করিয়া রাখিয়াছে ও কালের সমস্ত মুহূর্ত্তকে এক মহাকালের মধ্যে কবলিত করিয়া রাখিয়াছে—তাহার পার্শ্বে বা সম্মুখে দ্বিতীয়ের স্থান নাই; এই জন্য আকাশের সমস্ত বিন্দু মিলিয়া যদি একটি মাত্র বিন্দুতে সম্ভুক্ত হইয়া যায়, তবে সেইরূপ-একটি বিন্দুই পারমার্থিক অদ্বৈত-ভাবের সহিত উপমেয়। আকাশের পার্শ্ব-ভেদ এবং অগ্রপশ্চাৎ-ভেদ উভয়ই আছে; কালের পার্শ্ব-ভেদ নাই কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ ভেদ আছে; সর্ব্বময় এবং সর্ব্বাতীত পরম একত্বের পার্শ্বভেদও নাই, অগ্র পশ্চাৎ ভেদও নাই। যেমন পার্শ্ব-ঘটিত কোন তত্ত্ব কাল-রাজ্যে স্থান পাইতে পারে না, সেইরূপ অগ্র পশ্চাৎ ঘটিত কোন তত্ত্ব পরম অদ্বৈত রাজ্যে স্থান পাইতে পারে না।

আত্মার অদ্বৈত-প্রদেশ আমাদের দেশীয় দর্শন-শাস্ত্রে নিরুপাধিক শব্দে অভিহিত হইয়াছে। কাণ্ট প্রভৃতি ইউরোপীয় দার্শনিকেরা সেই প্রদেশকে Transenscendent এই শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। মূল-তত্ত্ব-সকলের দৈশিক এবং কালিক প্রয়োগ (অর্থাৎ যেরূপ প্রয়োগ দেশ-কালের সম্বন্ধেই খাটে সেইরূপ প্রয়োগ) আত্মার নিরুপাধিক প্রদেশে সংলগ্ন হয় না বলিয়া অনেকে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উক্ত নিরুপাধিক প্রদেশ মনুষ্য-জ্ঞানের একেবারেই অধিকার-বহির্ভূত। কাল-রাজ্যে পার্শ্ব-ঘটিত কোন তত্ত্বেরই প্রয়োগ সম্ভবে না—ইহা দেখিয়া আমরা অনায়াসে বলিতে পারিতাম যে, কাল-রাজ্য আমাদের জ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত, কিন্তু তাহা তো আমরা বলি না! তাহা যদি হইল তবে—অগ্র পশ্চাৎ ঘটিত কোন তত্ত্ব আত্মার নিরুপাধিক প্রদেশে খাটে

না—এইটি শুধু দেখিয়া কেমন করিয়া আমরা জানিব যে, আত্মার নিরুপাধিক প্রদেশ একেবারেই আমাদের জ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত।

কাণ্ট্ বলেন যে, যদি কার্য্য-কারণ-তত্ত্বকে উহার কালিক প্রয়োগ হইতে বিযুক্ত করিয়া ভাবা যায়, তবে কার্য্য-কারণ-তত্ত্বের কিছুই আর থাকে না। মনে কর, উত্তাপ সংযোগে বরফ গলিয়া জল হইয়া যাইতেছে—কঠিন অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া তরল অবস্থায় উপনীত হইতেছে; যে শক্তির প্রভাবে কঠিন জল তরল হইতেছে—তাহা অবশ্য পূর্ব্ববর্ত্তী কঠিন অবস্থা এবং পরবর্ত্তী তরল অবস্থা এই দুই অবস্থার সন্ধিস্থলে বর্ত্তমান; কিন্তু যদি ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী পরবর্ত্তী উভয়কেই বাদ দিয়া শুদ্ধ সেই শক্তিটিকে আমরা ধরিতে যাই—তবে আমরা মনে করি বটে যে, এইবার মুষ্টি-মধ্যে একটা-কিছু পাইলাম,—কিন্তু হাত মেলিয়া দেখি—শূন্য! তৈল আর জল যখন কাচ-পাত্রে অবস্থিত হয়, তখন উভয়ের সন্ধিস্থল-বর্ত্তী রেখা-চক্রটি দিব্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু যদি একদিক্ হইতে তৈল এবং আর একদিক্ হইতে জল সরাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সে রেখা কোথায় থাকে? সোপাধিক কার্য্য-কারণ আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু নিরুপাধিক কারণকে কিরূপে আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করিব?

কাণ্টের এই প্রশ্নটির মীমাংসা কালিক যুক্তি-প্রণালী অনুসারে অসম্ভব, ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি; এমন কি, কাণ্ট্ আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে, নিরুপাধিক তত্ত্বের পক্ষে কালিক বা সাংসারিক যুক্তি-প্রণালী বৈধ প্রণালী নহে। কাণ্ট্ তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সোপাধিক যুক্তি-পথ অবলম্বন করিয়া নিরুপাধিক রাজ্যে যাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র—কেননা সে পথ একটি প্রকাণ্ড গোলোক ধাঁদা।

আমরা যাহা বলিতে চাই তাহা সংক্ষেপে এই যে, নিরুপাধিক কারণের ভাব—দূরে কোথাও নহে—আমাদের আত্মার স্বাধীনতাতেই অন্তর্নিহিত আছে, যদি বল "তাহার প্রমাণ কি" তবে তাহার উত্তর এই যে, সাধু ব্যক্তির অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-কার্য্যই তাহার প্রমাণ; যে ব্যক্তি যত ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করে, সে ব্যক্তি ততই আত্মার অশরীরী নিরুপাধিক ভাব আপনার নিকট এবং অন্যের নিকট সপ্রমাণ করে। যদি বল যে, "কার্য্য-কারণময় জগতে স্বাধীনতা কিরূপে সম্ভবে—ইহা আমাকে বুঝাইয়া দেও," তবে তাহার উত্তর এই যে, ও-বিষয়টি বুঝা যেমন সহজ—বুঝানো তেমন সহজ নহে।

যাহা কিছু আকাশে বিস্তৃত ও কালে পরিবর্ত্তমান, তাহা যেমন-টি আমরা বুঝি, তেমনি-টি অন্যকে বুঝাইয়া দিতে পারি; যে ব্যক্তি পর্ব্বত দেখে নাই, তাহাকে পর্ব্বত আঁকিয়া দেখাইতে পারি। মেরু প্রদেশ—যেখানে ছয় মাস ছয় মাস করিয়া রাত্রিদিনের উলট্ পালট্ হয়, সেখানকার কোন অধিবাসী এখানকার রাত্রিদিনের পর্য্যায় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে একটি রেখা টানিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, এই রেখাটিকে যদি তোমাদের যাণ্মাসিক দিন বলিয়া ধরা যায় তবে ইহার ১৮০ ভাগের অর্দ্ধেকটা আমাদের দিন ও অর্দ্ধেকটা আমাদের রাত্রি। বিভিন্ন আকাশ-ব্যাপী বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের আয়তন বিভিন্ন প্রকার, এজন্য সেই তিনের সেই সেই আয়তন নির্দ্দেশ করিলেই জিজ্ঞাসু ব্যক্তি সেই সেই বস্তুর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে; অমুক পুষ্করিণী দীর্ঘে বিশ হাত প্রস্থে দশ হাত গভীরে তিন হাত

এই কথাটি শুনিবা-মাত্র, পুষ্করিণীটির আকৃতি জিজ্ঞাসু ব্যক্তির বোধায়ত্ত হয়; বিভিন্ন কাল-ব্যাপী ঘটনার উৎপত্তি স্থিতি এবং পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করিয়া লোককে তাহার ভাব বুঝানো যাইতে পারে;—প্রত্যুষে পদ্মের কলিকা বিকসিত হয়, সারা দিন তাহা সেই রূপ থাকে, রাত্রিতে তাহা মুসড়িয়া যায়,—ইহা বলিবামাত্র জিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাহার ভাব বুঝিতে পারে। কিন্তু আত্মার স্বাধীনতার না আছে দীর্ঘ্য, না আছে প্রস্থ, না আছে বেধ, না আছে ভাব-পরিবর্ত্তন, কাজেই তাহা আপন-মনে বুঝিলেও অন্যকে বুঝাইবার উপায় নাই; তবে, কার্য্য-দ্বারা প্রকারান্তরে বুঝানো যাইতে পারে,—স্বাধীন কার্য্য-দ্বারা আত্মার স্বাধীনতা বুঝানো যাইতে পারে, "ফলেন পরিচীয়তে"। এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, "ফলেন পরিচীয়তে" যদি সত্য হয়,তবে তো মনুষ্য আপাদ-মস্তক পরাধীন,—যাহারা উদরের জ্বালায় অস্থির তাহাদের স্বাধীনতা কোথায়? ইহার উত্তর এই যে, মনুষ্য অনেক অংশে পরাধীন ইহা আমি অস্বীকার করি না; তেমনি, সে যে কতক অংশে স্বাধীন ইহা তুমিও অস্বীকার করিতে পার না; কেননা তুমি নিজেই কার্য্য-কালে তোমার নিজের স্বাধীন বিবেচনা-শক্তি অনুভব করিয়া থাক। আমি বলিতেছি ভারতবর্ষে হিমালয় আছে, তুমি কন্যাকুমারীতে দাঁড়াইয়া বলিতেছ "এই তো ভারতবর্ষ, কই কোথাও তো হিমালয় দেখিতেছি না"; আমি বলিতেছি "মনুষ্যে স্বাধীনতা আছে," তুমি মনুষ্যের ভৌতিক অংশ লক্ষ্য করিয়া বলিতেছ "কই এখানে তো স্বাধীনতার নাম-গন্ধও দেখিতেছি না।" তোমার জানা উচিত যে, ভারতবর্ষের উত্তর-প্রদেশেই হিমালয়,—দক্ষিণ-প্রদেশে নহে; মনুষ্যের আধ্যাত্মিক প্রদেশেই স্বাধীনতা—ভৌতিক প্রদেশে নহে; এবং সেই স্বাধীনতাকে কার্য্যে সপ্রমাণ করাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব।

মূল-কারণ আছেন এবিষয়ে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না; কেননা মূল-কারণ নাই অথচ শাখা কারণ আছে—ইহা শিরোনাস্তি শিরঃপীড়ার ন্যায় অসম্ভব। তবে—আরোহী প্রণালী দ্বারা যদি আমরা মূল-কারণ পর্য্যন্ত উঠিতে চেষ্টা করি—তাহার পূর্ব্বেই আমাদের জানা উচিত যে, তাহাতে আমরা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। আরোহী প্রণালী অনুসারে নহে কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রণালী অনুসারে আমরা মূল কারণের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি; সে প্রণালী এইরূপ;—স্বাধীন আত্মা পরমাত্মাকে চায়—যাহা সে চায় তাহা সে ক্রমশই পাইতে থাকে—পরমাত্মাকে যতই পায় ততই আপনার ধ্রুব অবলম্বন পায়। এ কথাটির তাৎপর্য্য এই যে,—স্বাধীন আত্মার অল্প কোন কিছুতেই আশা-পূর্ত্তি হইতে পারে না, স্বাধীন আত্মার উদ্দেশ্য মহান্ উদ্দেশ্য; ব্রহ্মার দিন তাহার নিকট এক মুহূর্ত্তও নয়, অনন্ত নীল নভোমণ্ডল তাহার ক্ষুদ্র একটি পিঞ্জরের আবরণও হইতে পারে না। পরিপূর্ণ মহান্ পুরুষ—স্বাধীন আত্মার একমাত্র উপজীবিকা। পৃথিবীর ধূলিতে লয় পাইবার জন্য শরীর হইয়াছে,—স্বাধীন আত্মা তাহার জন্য হয় নাই।—স্বাধীন আত্মার ধারণা-শক্তি যেমন অগাধ—সেইরূপ তাহার লক্ষ্য মহান্—তাহার গতি অনন্ত। সমস্ত জগৎ ছাড়াইয়া পরমাত্মার ক্রোড়ে গিয়া তবে সে তৃপ্তি লাভ করে, নিরালম্ব পুরুষকে অবলম্বন করিতে পারিলে তবেই সে আপ্তকাম হয়।

যাহা এতক্ষণ-ধরিয়া ব্যাখ্যাত হইল সমস্তই উপনিষদের এই দুই পংক্তি শ্লোকের মধ্যে স্পষ্ট রূপে ইঙ্গিত করা হইয়াছে:

প্রথম পংক্তি ;—যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

দ্বিতীয় পংক্তি ;—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন।

প্রথম পংক্তির তাৎপর্য্য এই যে, আরোহী প্রণালী দ্বারা আমরা পরব্রহ্মকে কিছুতেই নাগাল পাইতে পারি না—মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়।

দ্বিতীয় পংক্তির তাৎপর্য্য এই যে, আধ্যাত্মিক প্রণালী অনুসারে যখন আমরা তাঁহার নিরুপাধিক আনন্দকে উপলব্ধি করি, তখন আর আমাদের ভয় থাকে না। আত্মার অভ্যন্তর-স্থিত মুক্তির রাজ্য কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত—তাহাই নিরুপাধিক আনন্দের দ্বার ;—সেইখানেই আমরা আনন্দ স্বরূপের অমৃত আস্বাদন করিয়া মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি ;—কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ধর্ম্মসাধন দ্বারা চিত্তকে বিষয়াসক্তি হইতে নির্ম্মুক্ত করা নিতান্তই প্রয়োজন।

ধর্ম্মপ্রচারক ও মহাত্মা রামমোহন রায়।

গত কএক সংখ্যক ধর্ম্মপ্রচারকে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাহার প্রত্যুত্তরের জন্য আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা নয়। কিন্তু তিনি রামমোহন রায়কে যেরূপ বুঝিয়াছেন এবং তাঁহার যে সমস্ত কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা দেখিলে আপাতত অনেকেরই ভ্রম হইবে যে রামমোহন রায় একজন অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক ছিলেন এবং হিন্দুশাস্ত্রের সকল প্রকার মতে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। এই ভ্রমটী দূর করা আমাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

আমাদের প্রথম কথা এই এখনকার আলোকে রামমোহন রায়কে বুঝা যায় না। এখন যেরূপ জনসমাজ ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে কিছু এরূপ ছিল না। তখন শিক্ষার অবস্থা অতি শোচনীয়। প্রায় সাধারণেই অশিক্ষিত ছিল। কতকগুলি লোক বিষয়কার্য্যে উপযোগি হইবার জন্য সামান্যরূপ পারসীক ভাষা শিক্ষা করিত। আর অল্প সংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কেবল বিধি ব্যবস্থা দিবার জন্য কএকখানি নব্য স্মৃতি এবং কেহ কেহ বা নব্য ন্যায়শাস্ত্র পড়িতেন। কিন্তু অগাধ শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে এরূপ লোক তখন বিরল ছিল। তৎকালে রামমোহন রায়ের সহিত সাধারণের যেরূপ বিচার হইয়াছিল সেই সমস্ত আলোচনা করিলে ইহার অনেকটা প্রমাণ পাওয়া যায়। এইরূপ জনসমাজ রামমোহন রায়ের যুদ্ধক্ষেত্র। তাঁহার লক্ষ্য ক্রিয়াকাণ্ড উচ্ছেদ করিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু শাস্ত্রবিচার না করিলে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। এই জন্য তিনি এই অগাধ শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য একেশ্বরবাদ স্থাপন। এই প্রসঙ্গে তিনি তর্কের মুখে প্রতিপোষক বাক্য শাস্ত্রের মধ্যে যেখানে যাহা পাইয়াছেন তাহাই উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় বচন পাঠমাত্রেই বোধ হইবে যে হিন্দুশাস্ত্রের সকল কথাতেই তিনি বিশ্বাস করিতেন। বাস্তব তাহা নহে। যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ একেশ্বরপর প্রতিপক্ষের অবগতির জন্য তাহা উদ্ধৃত করিতে গিয়া তাহার সঙ্গে এমন অনেক শাস্ত্রীয় কথা বাহির করিয়াছেন যে গুলি পড়িলে স্পষ্টই বোধ হয় তিনি জীব ব্রহ্মের একত্ব মানিতেন। প্রাচীন কল্পের পঞ্চযজ্ঞাদি সকল প্রকার গার্হস্থ্য ক্রিয়ার আবশ্যকতা স্বীকার

করিতেন। কিন্তু বস্তুত তাহাই কি ঠিক্। এস্থলে একটী কথা বলা বিশেষ আবশ্যক। যখন তাঁহার সহিত সর্ব্বসাধারণের ঘোরতর শাস্ত্রীয় বিচার হয় তখন তিনি আপনাকে কুত্রাপি ব্যক্ত করেন নাই। যা কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন সমস্তই শাস্ত্র। এইগুলি ধরিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে অবশ্যই ঘোর বৈদান্তিক বোধ হইবে। কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার আপনাকে ব্যক্ত করা আবশ্যক হইয়াছিল। তাহা আলোচনা করিলে তিনি যে কি ছিলেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি লর্ড বেণ্টিকের সময় যখন শিক্ষাসমিতিকে পত্র লিখেন তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন বেদান্ত দর্শন এদেশের যথেষ্ট অপকার করিয়াছে। তাঁহার অভিপ্রায় এই যাহাতে সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য আনে সে ধর্ম্ম জনসমাজের উপযোগি নহে কিন্তু যে ধর্ম্ম লোকের কর্ম্মঠ ভাব বর্দ্ধিত করিবে তাহাই সামাজিক ধর্ম্ম হওয়া আবশ্যক। এখন দেখ বেদান্ত ধর্ম্ম পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বলিতেছেন কেহই কাহার নয়, সকলই মায়া, এই যে জগৎ দেখিতেছ ইহারও বাস্তব সত্তা নাই। বেদান্তের এই সমস্ত ভাব লোকের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিলে সামান্য উদরান্ন সংগ্রহের নিমিত্তও কি কাহারও প্রবৃত্তি হয়? এখন দেখ রামমোহন রায়ের এই পত্রখানি আলোচনা করিলে কখনই বোধ হয় না যে তিনি বৈদান্তিক ছিলেন। তবে তুমি বলিতে পার যদি তিনি তাহাই না হইলেন তবে বিচার-মুখে পুনঃপুনঃ বেদান্তবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন কেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি এখনকার আলোকে রামমোহন রায়কে বিচার করিলে চলিবে না। তিনি যে সময়ে জন্মিয়া ছিলেন তখন যদিও শাস্ত্রের গভীর আলোচনা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল কিন্তু শাস্ত্রের উপর লোকের শ্রদ্ধা কিছুমাত্র লুপ্ত হয় নাই। তখন গৃহে গৃহে পুষ্প চন্দনে শাস্ত্র পূজিত হইত। আর এতদ্দেশে বেদান্তের ন্যায় একেশ্বরপ্রতিপাদক দ্বিতীয় গ্রন্থও নাই। সেই জন্য রামমোহন রায় লোকের সহজে বিশ্বাস হইবার জন্য তাহাই অবলম্বন করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। ইহার সঙ্গে অবশ্য এমন সকল বৈদান্তিক মত উদ্ধৃত করিয়া ছিলেন যেগুলি বাদ দিয়া বলা তাঁহার পক্ষে কালোচিত নয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তজ্জন্য কিছুমাত্র ইতস্তত করেন নাই। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য যেন তেন প্রকারেণ কর্ম্মকাণ্ডের উচ্ছেদ ও একেশ্বরবাদ প্রচার। তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। বাস্তব তিনি বৈদান্তিক নন এবং শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মীও নন।

এস্থলে আর একটু কথা বলি। কি ধর্ম্মসংস্কারক কি সমাজসংস্কারক সকলেরই সংস্কার কার্য্যে দেশকালের অপেক্ষা রাখা আবশ্যক। নচেৎ তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। এখন বুঝিয়া দেখ রামমোহন রায়ের সময় জনসমাজের অবস্থা কিরূপ। কেবল অজ্ঞানতার অন্ধকার ও শাস্ত্রে কেবল একটা অন্ধ ভক্তি। সেই অবস্থায় রামমোহন রায় যদি শাস্ত্রের কোন কোন অংশ বাদসাদ দিয়া নিজের হৃদয়ানুগত ও শাস্ত্রের মর্ম্মানুগত কথা তর্কমুখে আনিতেন তাহা হইলে লোকে তাহা গ্রহণ করিতে পারিত না। এই জন্য তিনি সে দিকে যান নাই। তিনি প্রমাণস্থলে এমন একটি শ্লোক তুলিয়াছেন হয়ত তাহার তৃতীয়াংশ জ্ঞানাস্ত্রে টেকে না, আর এক দেশ টেঁকে। কিন্তু স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য তাঁহাকে সমস্তটাই উদ্ধৃত করিতে হইল। জনসমাজের তাৎকালিক অবস্থা ধরিয়া বুঝিলে ইহাতে কিছুই দোষ দৃষ্ট হইবে না। কারণ

ক্রিয়কাণ্ড উচ্ছন্ন করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার আমার উদ্দেশ্য। এস্থলে বেদান্ত বা অন্য কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ অদ্বৈতবাদে আবৃত থাকিলেও আমার অভিপ্রেত একেশ্বরপ্রতিপাদক কথা তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে রহিয়াছে। আর আমার বিশ্বাস তদ্দ্বারাই লোকের চৈতন্য সম্পাদন করিব। রামমোহন রায় এই বিশ্বাস ও আশ্বাসে সেই ঘোর অন্ধকারময় কালে বেদান্ত-বাক্য দ্বারা একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া যান। প্রথম সংস্কারকের কর্ত্তব্যই এই যে,যে কোন উপায়ে হউক, জনসমাজকে একটা বন্ধনে আনয়ন করা। পরবর্ত্তী সংস্কারকের কর্ত্তব্য তাঁহার আবর্জ্জনা সকল মুক্ত করিয়া তাঁহার অভিপ্রায়কে বিশুদ্ধরূপে প্রদর্শন করা। সংস্কার-কার্য্য চিরকাল এই প্রণালীতেই হইয়া আসিতেছে। রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারক প্রধান আচার্য্য মহাশয়। তিনি বহু পরিশ্রমে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাঁহার জ্ঞান ও জীবন ব্রাহ্ম সমাজের বক্ষে যে পরিবর্ত্তন আনিয়াছে চন্দ্রশেখর বাবু তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই বাক্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাইবেন।

যাক্, রামমোহন রায় যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন না তাহার প্রমাণ অনেক আছে। এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে তাহার সমাবেশ হইতে পারে না। তবে একটী কথা বলি। জীব ব্রহ্মের একত্ব-মতে বিশ্বাস থাকিলে উপাস্য উপাসক ভাবের আর স্থান থাকে না। কিন্তু রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহার সময় বেদবাক্যে ঈশ্বরের স্তুতি পাঠ হইত, গায়ত্রী-মন্ত্রে তাঁহার ধ্যান হইত এবং বৈরাগ্য-সূচক সঙ্গীতে তাঁহার প্রতি নির্ভরের ভাব বর্দ্ধিত করা হইত। যদি জীব ব্রহ্মের একত্বে তাঁহার বিশ্বাসই ছিল তবে ব্রাহ্মসমাজে এই বিসম্বাদী পদার্থের আবার অবতারণা কেন।

ভাল, আরও একটা দিক দিয়া দেখ। রামমোহন রায় যখন খ্রিষ্টানদের সহিত সংগ্রাম করিয়া ছিলেন তখন বাইবল তাঁহার অবলম্বন ছিল। তবে তিনি কি খ্রিষ্টান? না তা নয়। তিনি বাইবল দিয়া দেখাইয়াছেন এক ঈশ্বরই মনুষ্যের ত্রাণকর্ত্তা। তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। তিনি বেদান্ত ও বাইবলের ন্যায় কোরাণ অবলম্বন করিয়া মুসলমান সমাজে প্রবেশ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি বাস্তবিক কি মহম্মদের উপাসক মুসলমান? না তা নয়। আমরা আবার বলি তাঁহার প্রধান লক্ষ্য সকল দেশে সকল জনসমাজে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করা। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে এই অগ্নি গূঢ় ও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাঁহার প্রধান চেষ্টা ইহার ভস্মাচ্ছাদন অপসারিত করা। পরে যখন লোকে সত্য ধর্ম্মটী গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে তখন সেই ধর্ম্মের আলোকে তাহার চক্ষে সমস্ত তত্ত্বই উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে। তখন কোনরূপ বদ্ধভাব আর তাহার উন্নতির পথে কণ্টক দিতে পারিবে না।

এক্ষণে আমরা চন্দ্রশেখর বাবুকে দেখাইব ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি কি! উপরে স্পষ্টই বলিয়াছি যে রামমোহন রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদ উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা কি বোধ হইল? যে সত্য জনসাধারণ সেই বিশ্বব্যাপক সত্যের উপর এই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। যাহা দেশ ও কালের অনায়ত্ত অথচ সকল দেশ ও সকল কালে সমান দীপ্তিতে প্রকাশ পায় তাহাই সত্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদই হউক বাইবলই হউক পুরাণই হউক কোরাণই হউক যে কোন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে এই বিশ্বজনীন সত্য উদ্ধৃত হইবে তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। কিন্তু দেশভেদে ইহার বাহ্য পরিচ্ছদ ভিন্নরূপ হওয়া আবশ্যক। বলিতে

কি তাহা না হইলে চলিবে না। মনে কর হিন্দুস্থানে আমার জন্ম আমি জাতিতে হিন্দু। তুমি যদি বাইবল দিয়া আমার নিকট সত্যটি বুঝাইতে চাও সত্যপ্রিয়তা থাকিলেও তদ্দ্বারা আমার উপকার হইবে না। কারণ বিশ্বজনীন সত্য আমার নিকট যে পরিচ্ছদে আইল তাহা আমার পুরুষ-পরম্পরায় অপরিচিত। উহাতে এমন সকল কথা ও এমন সকল ভাব আছে তাহা অবশ্য সত্যের অগ্নিপরীক্ষায় টেঁকিয়াছে কিন্তু তাহার পরিচ্ছদ আমার অপরিচিত বলিয়া তাহা আমার প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারিল না। সুতরাং তদ্দ্বারা আমার কোন কাজই হইল না। কিন্তু যাই সেই সত্য আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থের মধ্য দিয়া আইল অমনি তাহা আমার প্রাণকে স্পর্শ করিল। কারণ জাতীয় কথা ও জাতীয় ভাব আমাদের পুরুষপরম্পরায় পরিচিত। ফল কথা সত্যটি কেবল শিক্ষার জন্য নয় ইহা দিনরাত ব্যবহারে আনিবার জন্য। সুতরাং যাহা আমার প্রাণকে স্পর্শ না করে আমি কোন্ বলে তাহাকে জীবনের সহিত মিশ্রিত করিব। এই জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের এত আদর। এই সমস্ত ঋষিবাক্য আমাদের সত্য সাধনের অনুকূল। চন্দ্রশেখর বাবু অন্যান্য সমাজের তুলনা দিয়া বলিয়াছেন কালে আদি ব্রাহ্মসমাজেও বেদবাক্য ও ঋষিবাক্যে আদর থাকিবে না। কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি হিন্দুর রক্তে ও হিন্দুর ভাবে পুষ্ট হইয়া যত কাল জীবিত থাকিব, পরম পুরুষার্থ মুক্তি যদি আমাদের প্রার্থনীয় হয় তবে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থে নিবদ্ধ বেদবাক্য ও ঋষিবাক্যে কদাচ আমাদের অনাদর হইবে না। তবে চন্দ্রশেখর বাবু যদি চা'ন যে, পূর্ব্বকালের সমস্ত যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান—সমগ্র কর্ম্মকাণ্ড, অথবা ষড় দর্শনের পরস্পর-বিরোধী তুমুল বাদানুবাদ—সমগ্র জ্ঞান-কাণ্ড, আবার আসিয়া ভারতকে অধিকার করুক,—শঙ্কর ভাষ্য, রামানুজের ভাষ্য, ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের ভাষ্য, আবার কোমর বাঁধিয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হউক, এবং তাহার সহিত আধুনিক ভাষ্যকারেরাও সংগ্রামে মাতিয়া উঠুন—তাহা হইলে তিনি হিন্দু-ধর্ম্মে নূতন জীবন প্রদান করিতে গিয়া করিবেন যাহা তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, এই বাক্যটি সপ্রমাণ করিবেন

"শ্রুতির্বিভিন্না স্মৃতয়োবিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-নীতি।

প্রথম অধ্যায়।

রিপু সংযম।

চতুর্থ প্রস্তাব।

মোহ।

আমাদিগের আত্মা এই অস্থিচর্ম্মময় শরীরে বদ্ধ থাকা নিমিত্ত যে সকল পার্থিব বস্তুতে আমাদিগের অনুরাগের উৎপত্তি হয় সেই অনুরাগ নিয়মিত করিয়া, ধর্ম্মানুসারে তাহার ব্যবহার করিয়া আমরা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিব, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। কিন্তু ঈশ্বরের এই অভিপ্রায় উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা যখন কোন পার্থিব বস্তু বা বিষয়ের প্রতি অযথা ও অপরিমিত অনুরাগ প্রদর্শন করি, সেই অনুরাগের আতিশয্যে অন্ধ হইয়া পড়ি এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হই, তখন আমরা সেই ঈশ্বর-প্রদত্ত অনুরাগকে মোহে পরিণত করিয়া ফেলি। পার্থিব সুখের প্রতি অনুরাগ দূষণীয় নহে, কিন্তু সেই অনুরাগ অপরিমিত হইয়া পড়িলে তাহা দ্বারা অন্ধীভূত

হইয়া যখন আমরা ধর্ম্মের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করি তখন আমরা সুখ-ভোগ-লালসা-জনিত মোহ-পরবশ হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হই। ধন সম্পদের প্রতি অনুরাগ দূষণীয় নহে। কিন্তু সেই অনুরাগ অত্যন্ত বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিলে তাহা দ্বারা অন্ধরূপে পরিচালিত হইয়া আমরা যখন অধর্ম্মাচরণ করি তখন আমরা ধন-সম্পদ-লালসা-জনিত মোহপরবশ হইয়া শোচনীয় দুর্গতিগ্রস্ত হই। স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ দূষণীয় নহে; কিন্তু যখন আমরা সেই অনুরাগে আমাদিগকে এতদূর আবদ্ধ হইতে দিই যে তাহার জন্য আমরা আমাদিগের আত্মার মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া পড়ি তখন আমরা সাংসারিক সম্বন্ধজনিত মোহ-পরবশ হইয়া আধ্যাত্মিক অধোগতি প্রাপ্ত হই। পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরাগ দূষণীয় নহে, কিন্তু সেই অনুরাগে যখন আমরা এতদূর আবদ্ধ হই যে তজ্জন্য অন্যায় ও ধর্ম্ম-বিরোধী কার্য্যে প্রবৃত্ত হই তখন পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরাগ-জনিত মোহাবিষ্ট হইয়া আমরা আমাদিগের পারমার্থিক ইষ্ট নাশ করিয়া থাকি। মোহ পার্থিব সুখ, পার্থিব সম্বন্ধ, পার্থিব ধনসম্পদ, ও এই পার্থিব জীবনের প্রতি ঈশ্বর-প্রদত্ত অনুরাগের বিকৃত আকার, উহার অপব্যবহার ও ব্যভিচার। অতএব এই মোহরিপু সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

পার্থিব সুখ, ধন সম্পদ, সম্বন্ধ ও জীবনের প্রতি ঈশ্বর-প্রদত্ত ধর্ম্ম-সিদ্ধ যে অনুরাগ তাহা আমাদিগের মঙ্গলের কারণ, কিন্তু উহার বিকৃত আকার যে মোহরিপু তাহা আমাদিগের নানা অমঙ্গল ও অনর্থের মূল। মোহের অধীন হইলে মানুষ সকল প্রকার ভয়ানক পাপে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যে ইন্দ্রিয় সুখ-বাসনা-জনিত মোহের অধীন হয় সে পরদার, ব্যভিচার প্রভৃতি ঘোর পাপে পতিত হয়; যে ধনসম্পদসম্ভোগেচ্ছা-জনিত মোহের বশীভূত হয়, সে প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য বৃত্তি প্রভৃতি অধর্ম্মাচরণ করে, যে সাংসারিক সম্বন্ধের প্রতি অনুরাগজনিত মোহে অভিভূত হয় সে ঈশ্বর ও পরকাল বিস্মৃতি রূপ মহাপাপে নিমগ্ন হয়; যে পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরাগজনিত মোহে আক্রান্ত হয় সে আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে সক্ষম হয় না। মোহ-পরবশ হইলে মানুষ যে সকল পাপে পতিত হয় তাহাতে যে কেবল তাহার আধ্যাত্মিক অবনতি ও দুর্গতি সাধিত হয় তাহা নহে, আধ্যাত্মিক অবনতি ও দুর্গতির অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ যে শারীরিক ও মানসিক অবনতি ও দুর্গতি ঘটে সে তাহারও ভাগী হয়। সংক্ষেপতঃ, মোহরিপুর অধীন হইলে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন ঘোরতর অমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান উপদেশ এই যে পার্থিব সুখ, পার্থিব ধনসম্পদ, পার্থিব সম্বন্ধ ও পার্থিব জীবনের প্রতি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অনুসারে যেরূপ ধর্ম্মসিদ্ধ অনুরাগ প্রদর্শন করা উচিত, যেরূপ নিয়ন্ত্রিত প্রীতি রক্ষা করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ অনুরাগ সেইরূপ প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিবেক, কখন সেই অনুরাগকে অপরিমিত আকার ধারণ করিতে দিবেক না, কখন তাহাকে অযথারূপে চালিত করিবেক না, কখন তাহার অপব্যবহার করিয়া তাহাকে মোহে পরিণত করিয়া ফেলিবেক না; যদি তুমি তাহা কর তাহা হইতে তোমাকে ধর্ম্মচ্যুত এবং পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে দুঃসহ সন্তাপ ভোগ করিতে হইবেক। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন;

"যত্র নিঃশ্রেয়সং বাক্যং মোহাৎ প্রতিপদ্যতে।
স দীর্ঘসূত্রী হীনার্থঃ পশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে॥

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিত বাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘসূত্রী হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হয়।"

ব্রাহ্ম যিনি তিনি সকল পার্থিব বস্তু ও বিষয়ের প্রতি ঈশ্বর-প্রদত্ত অনুরাগ সযত্নে রক্ষা করিয়া চলেন, তিনি কখন তাহা মোহে পরিণত করিয়া ফেলেন না। তিনি পার্থিব সুখ ও ধন সম্পদের অনুরাগী হয়েন, কিন্তু তাহাদিগের জন্য তিনি কখন ধর্ম্মের পথ ত্যাগ করেন না; তিনি আত্মীয় বন্ধু পরিজনের প্রতি অনুরক্ত হয়েন, কিন্তু সেই অনুরাগে অন্ধ হইয়া কোন অন্যায় বা অধর্ম্মাচরণ করেন না; তিনি পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরাগ রক্ষা করেন, কিন্তু সে অনুরাগে অনুরাগী হইয়া আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে ভুলিয়া যান না। তিনি পৃথিবীতে থাকেন, কিন্তু পৃথিবীর কিছুতেই তিনি মোহ-মুগ্ধ হয়েন না; পৃথিবীর সকল বিষয়ের যেরূপ নশ্বর ও আপাত-মনোরম প্রকৃতি তাহা তিনি ঠিক্ বুঝিতে পারেন, অতএব তাহাদিগের বাহ্য চাক্‌চিক্য ও শোভায় মোহান্ধ হইয়া তিনি কখন জ্ঞান হারান না। যতটুকু পৃথিবীর হওয়া আবশ্যক তিনি ততটুকু পৃথিবীর হইয়া আধ্যাত্মিক জগতের লোক হয়েন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট পরিচয় দিয়া যিনি এইরূপে মোহরিপুকে বশ করিতে না পারেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম নামের অবমাননা করেন, তিনি কখন প্রকৃত রূপে ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারেন না।

উদ্ধৃত।

সত্য।

সরল রেখা আঁকা সহজ নহে, সত্য বলাও সহজ ব্যাপার নহে। সত্য বলিতে গুরুতর সংযমের আবশ্যক। দৃঢ় নির্ভর দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তোমাকেই সত্যের অনুসরণ করিতে হইবে, সত্য তোমার অনুসরণ করিবে না। আমরা অনেক সময়ে মনে করিয়া থাকি, সত্য যে সত্য হইল সে কেবল আমি প্রচার করিলাম বলিয়া। সত্যের প্রতি আমরা অনেক সময়ে মুরুব্বিয়ানা করিয়া থাকি—আমরা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলি, তোমার কিছু ভয় নাই, আমি তোমাকে খাড়া করিয়া তুলিব। সত্যের যেন বাস্তবিক কোন দাওয়া নাই তাই আমার অনুগ্রহের উপরে সে দাবী করিতে আসিয়াছে, এবং আমি তাহাকে আমার মহৎ আশ্রয় দিয়া যেন কৃতার্থ করিলাম এবং হৃদয়ের মধ্যে মহত্ত্বাভিমান অনুভব করিলাম। এইরূপে সত্যের চেয়ে বড় হইতে গিয়া আমরা সত্যকে দূর করিয়া দিই, মিথ্যাকে আহ্বান করিয়া আনি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, সত্য সমস্ত জগতের আশ্রয়স্থল, এ জন্য সত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুগ্রহ বা তোষামোদের বশ নহে। আমার সুবিধামত আমি যদি সত্যকে বাঁকাইতে পারিতাম ত সত্য কি সহজ হইতে পারিত! কিন্তু আমি সত্যের কাছে বাঁকিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারি, সত্য তাহার অটল সরল সুন্দর মহিমায় দাঁড়াইয়া থাকে—সত্য আমার মুখ তাকাইলে চলে না, কারণ সকলেই তাহার মুখ তাকাইয়া আছে।

এই জন্যই সত্যের এত বল! সত্য আমার প্রতি নির্ভর করে না বলিয়াই আমি সত্যের প্রতি নির্ভর করিতে পারি। সত্যকে যদি আবশ্যকমত বাঁকান যাইতে পারিত তবে আমরা সিধা থাকিতাম কি করিয়া! সত্য যদি কথায় কথায় স্থান পরিবর্ত্তন করিত তবে আমরা দাঁড়াইতাম কিসের উপরে! সত্য যদি না থাকে তবে আমরা আছি কে বলিল!

আমরা যখন মিথ্যাপথে চলি, তখন আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি এই জন্য। তখন আমরা আত্মহত্যা করি। তখন আমরা একেবারে আমাদের মূলে আঘাত করি। আমরা যাহার উপরে দাঁড়াইয়া আছি তাহাকেই সন্দেহ করিয়া বসি। যতখানি আমাদের মিথ্যা অভ্যাস হয় ততখানি আমরা লুপ্ত হইয়া যাই। সত্যের প্রভাবে আমরা বাড়িতে থাকি, মিথ্যার বশে আমরা কমিয়া আসি। কারণ সত্যরাজ্যের সীমানা কোথাও নাই। দেশ, জাতি, সম্প্রদায়, আত্মপর প্রভৃতি যে সকল ব্যবধানকে আমরা পাষাণ প্রাচীর মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলাম, সহসা সত্যের বিদ্যুতালোকে দেখি তাহারা কোথাও নাই। তাহারা আমার কল্পনায়। তাহারা অসীম সত্যরাজ্যের কাল্পনিক সীমানা, বালুকার উপরে মানুষের অঙ্গুলির চিহ্ন। তাহারা ছেলে ভুলাইয়া আমার অধিকার সংক্ষেপ করিতেছে। মিথ্যা আমাদিগকে

এই বৃহৎ জগতের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে। সত্যের আশ্রয়ে আমরা বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ি, মিথ্যা তাহার কুঠারাঘাতে প্রতিদিন আমাদিগকে ছেদন করিতে থাকে। মিথ্যা আমাদিগকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া দেয়, অল্পে অল্পে আমাদের সব কাড়িয়া লয়—আমাদের আশ্রয়ের স্থান, আমাদের জীবনের খাদ্য, আমাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। এমন ঘোর দারিদ্র্য জন্মাইয়া দেয় যে, পৃথিবী-সুদ্ধকে দরিদ্র দেখি, অন্নপূর্ণাকে অন্নহীনা বলিয়া বোধ হয়।

ইহার প্রমাণ কি আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই না? আমরা মিথ্যাচারীর দল আমরা প্রতিদিন প্রতি ক্ষুদ্র কাজে কি মনে করি না যে, ন্যূনাধিক প্রবঞ্চনা ব্যতীত পৃথিবীর কাজ চলিতে পারে না, খাঁটি সত্য ব্যবহার কেতাবে পড়িতে যত ভাল শুনায় কাজের বেলায় তত ভাল বোধ হয় না। অর্থাৎ যে নিয়মের উপর সমস্ত জগৎ নির্ভয়ে নির্ভর করিয়া আছে, সে নিয়মের উপর আমি নির্ভর করিতে পারি না; মনে হয় আমার ভার সে সামলাইতে পারিবে না—চন্দ্র সূর্য্য তাহাতে গাঁথা রহিয়াছে কিন্তু আমাকে সে ধারণ করিতে পারিবে না, আমাকে সে বিনাশের পথে নিক্ষেপ করিবে। প্রতিদিন মিথ্যার জাল রচনা করিয়া আমরা সত্যকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছি যে, আমাদের স্থূলে ভুল, মূলে অবিশ্বাস জন্মায়—মনে হয় জগতের গোড়ায় গলদ্। এই জন্যই আমাদের ধারণা হয় যে, কেবল কৌশল করিয়াই টিঁকিতে হইবে। কৌশলই একমাত্র উপায়। ডাল পালা মনে করে আমি কৌশল করিয়া থাকিব, গুঁড়িতে সংলগ্ন হইয়া থাকা কোন কাজের নহে; গুঁড়ি বলে আমার শিকড় নাই, কোন প্রকার ফন্দী করিয়া সীধা থাকিতে হইবে। দুই পা বলে মাটিকে নিতান্ত মাটি জ্ঞান করিয়া আমি আপনারই উপরে দাঁড়াইব; সে কম কৌশলের কথা নয়, কিন্তু অবশেষে যে আশ্রয় ছাড়িয়া তাহারা লম্ফদেয়, সেই আশ্রয়ের উপরে পড়িয়াই তাহাদের অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়।

মনুষ্যসমাজের এই অতি বৃহৎ জটিল মিথ্যা ব্যবসায়ের মধ্যে পড়িয়া সত্যকে অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে কি কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে! চক্ষের উপরে চতুর্দ্দিক হইতে ধূলাবৃষ্টি হইতেছে—আমরা সত্যকে দেখিব কি করিয়া! আমরা জন্মাবধিই গুটিপোকার মত সামাজিক গুটির মধ্যে আচ্ছন্ন। অতি দীর্ঘ পুরাতন দৃঢ় মিথ্যাসূত্রে সেই গুটি রচিত। সত্যের অপেক্ষা প্রথাকে আমরা অধিক সত্য বলিয়া জানি। প্রথা আমাদের চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছে, আমাদের হাতে পায়ে শৃঙ্খল বাঁধিয়াছে, বলপূর্ব্বক আমাদিগকে চিন্তা করিতে নিষেধ করিতেছে, পাছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া আমরা সত্য দেখিতে পাই—বাল্যকাল হইতে আমাদিগকে মিথ্যা মান, মিথ্যা মর্য্যাদার কাছে পদানত করিতেছে; মিথ্যা কথন, মিথ্যাচরণ আমাদের কর্ত্তব্যের মত করিয়া শিক্ষা দিতেছে! আমরা বলি এক, করি এক; জানি এক, মানি এক;—স্নায়ুর বিকার ঘটিলে যেমন আমরা ইচ্ছা করি একরূপ অথচ আমাদের অঙ্গ অন্যরূপে চালিত হয়—তেমনি বিকৃত শিক্ষায় আমরা সত্যের আদেশ শুনি একরূপ, অথচ মিথ্যার বশে পড়িয়া অন্যরূপে চালিত হই। প্রথা বলে অন্যায়াচরণ কর পাপাচরণ কর তাহাতে হানি নাই, কিন্তু আমার বিরুদ্ধাচরণ করিও না, তাহা হইলে তোমার মানহানি হইবে, তোমার মর্য্যাদা নষ্ট হইবে—অতি পুরাতন মান, অতি পুরাতন মর্য্যাদা, সত্য তাহার কাছে কিছুই নয়। এই সকল সহ্য করিতে না পারিয়া মাঝে মাঝে মহৎলোকেরা আসিয়া মান মর্য্যাদা কুলশীল চিরন্তন প্রথা, সমাজের সহস্র মিথ্যাপাশ সকল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শত শত কারাবাসী মুক্তি লাভ করে। কেবল প্রথার প্রিয় সন্তান সকল, বহুকাল শৃঙ্খলের আলিঙ্গনে পড়িয়া জড় শৃঙ্খলের উপরে যাহাদের প্রেম জন্মিয়াছে, বিমল অনন্ত মুক্ত আকাশকে যাহারা বিভীষিকার স্বরূপে দেখে, তাহারাই তাহাদের ভগ্ন কারাপ্রাচীরের পার্শ্বে বসিয়া ছিন্ন শৃঙ্খল বক্ষে লইয়া মুক্তিদাতাকে গালি দেয় ও ভগ্নাবশেষের ধূলি স্তূপের মধ্যে পুনরায় আপনার অন্ধকার বাসগহ্বর খনন করিতে থাকে।

এই সমাজ-ধাঁদার মধ্যে পড়িয়া আমি সত্যের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে চাই। যেমন নানা রূপে বিচলিত হইলেও চুম্বক-শলাকা সরল ভাবে উত্তরের দিকে মুখ রাখে। সত্যের সহিত আত্মার যে একটি সরল চুম্বকাকর্ষণ যোগ আছে, সেইটি চিরদিন অক্ষুণ্ণভাবে যেন রক্ষা করিতে পারি! ভয় হয় পাছে সংসারের সহস্র মিথ্যার অবিশ্রাম সংস্পর্শে আত্মার সেই সহজ চুম্বক-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়! যেন এই দৃঢ় পণ থাকে যে, সত্যানুরাগের প্রভাবে চারিদিকের জটিলতা সকল ছিন্ন করিয়া সমাজকে সরল করিতে হইবে। মানুষের চলিবার পথ নিষ্কণ্টক করিতে হইবে। সংশয় ভয় ভাবনা অবিশ্বাস দূর করিয়াদিয়া দুর্ব্বলকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে।

আমাদের জাতি যেমন সত্যকে অবহেলা করে এমন আর কোন জাতি করে কি না জানি না! আমরা মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া অনুভব করি না। মিথ্যা

আমাদের পক্ষে অতিশয় সহজ স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। আমরা অতি গুরুতর এবং অতি সামান্য বিষয়েও অকাতরে মিথ্যা বলি। অনেক কাগজ বঙ্গদেশে অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে তাহারা মিথ্যা কথা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, পাঠকদের ঘৃণা বোধ হয় না। আমরা ছেলেদের সযত্নে ক খ শেখাই, কিন্তু সত্যপ্রিয়তা শেখাই না—তাহাদের একটা ইংরাজি শব্দের বানান-ভুল দেখিলে আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়, কিন্তু তাহাদের প্রতিদিবসের সহস্র ক্ষুদ্র মিথ্যাচরণ দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ করি না। এমন কি আমরা নিজে তাহাদিগকে ও তাহাদের সাক্ষাতে মিথ্যা কথা বলি ও স্পষ্টতঃ তাহাদিগকে মিথ্যা কথা বলিতে শিক্ষা দিই। আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়াইত এত ভীরু! এবং ভীরু বলিয়াই এমন মিথ্যাবাদী। আমরা ঘুসি মারিতে লড়াই করিতে পারি না বলিয়া যে আমরা হীন তাহা নহে—স্পষ্ট করিয়া সত্য বলিতে পারি না বলিয়া আমরা এত হীন। আবশ্যক বা অনাবশ্যক মত মিথ্যা আমাদের গলায় বাধে না বলিয়াই আমরা এত হীন। সত্য জানিয়া আমরা সত্যানুষ্ঠান করিতে পারি না বলিয়াই আমরা এত হীন। পাছে সত্যের দ্বারা আমাদের তিলার্দ্ধ মাত্র অনিষ্ট হয় এই ভয়েই আমরা মরিয়া আছি!

কবি গেটে বলিয়াছেন, মিথ্যা কথা বলিবার একটা সুবিধা এই যে তাহা চিরদিন ধরিয়া বলা যায়, অথচ তাহার সহিত কোন দায়িত্ব লগ্ন থাকে না, কিন্তু সত্য কথা বলিলেই তৎক্ষণাৎ কাজ করিতে হইবে, অতএব বেশীক্ষণ বলিবার অবসর থাকে না। মিথ্যার কোন হিসাব নাই ঝঞ্ঝাট নাই; কিন্তু সত্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার একটা হিসাব লাগিয়া আছে, তোমাকে মিলাইয়া দিতে হইবে। লোকে বলিবে, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য কিনা দেখিতে চাই! আমরা বাঙ্গালীরা মিথ্যা বলিতেছি বলিয়াই এত দিন ধরিয়া কাজ না করিয়াও অনর্গল বলিবার সুবিধা হইয়াছে; কাহাকেও হিসাব দিতে প্রমাণ দেখাইতে হইতেছে না—আমরা যদি সত্যবাদী হইতাম তবে আমাদের কাজও কথার মত সহজ হইত। আমরা সত্য বলিতে শিখিলেই আমরা একটা জাতি হইয়া উঠিব—আমাদের বক্ষ প্রশস্ত হইবে, আমাদের ললাট উচ্চ হইবে, আমাদের শির উন্নত হইবে, আমাদের মেরুদণ্ড দৃঢ় সবল ও সরল হইয়া উঠিবে। লাট্ ডাফরিনের প্রসাদে ভলান্টিয়র হইতে পারিলেও আমাদের এত উন্নতি হইবে না। সত্য কথা বলিতে শিখিলে আমরা মাথা তুলিয়া মরিতে পারিব, গুটিসুটি মারিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা দাঁড়াইয়া মরিতে সুখ বোধ হইবে। নিতান্ত ম্যালেরিয়া বা ওলাউঠায় না ধরিলে যে জাতি মরিতে জানে না, যে জাতি যেমন-তেমন করিয়াই হোক্ বাঁচিয়া থাকিতে চায়, সে জাতির মূলে অনুসন্ধান করিয়া দেখ তাহারা প্রকৃত সত্যপ্রিয় নহে। মিথ্যায় যাহাকে মারিয়া রাখিয়াছে সে আর মরিবে কি! সত্যের বলে যে জীবন পাইয়াছে সে অকাতরে জীবন দিতে পারে!

আমরা বাঙ্গালীরা আমাদের জীবনকে যতটা সত্য বলিয়া অনুভব করি আর কোন সত্যকে ততটা সত্য বলিয়া বোধ করি না—এই জন্য আমরা এই প্রাণটুকুর জন্য সমস্ত সত্য বিসর্জ্জন দিতে পারি, কিন্তু কোন সত্যের জন্য এই প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি না। তাহার কারণ, যাহা আমাদের কাছে মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত, তাহার জন্য আমরা এক কানাকড়িও দিতে পারি না, কেবল মাত্র যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করি তাহার জন্যই ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি। মমতার প্রভাবে মা সন্তানকে এতখানি জাজ্বল্য সত্য বলিয়া অনুভব করিতে থাকে, যে, সন্তানের জন্য মা আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে। আর, মিথ্যাচারীরা বলিয়া থাকে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি।" অর্থাৎ আপনার কাছে আর কিছুই সত্য নহে, দারা সত্য নহে, দারার প্রতি কর্ত্তব্য সত্য নহে!

অতএব, প্রাণ বিসর্জ্জন শিক্ষা করিতে চাও ত সত্যাচরণ অভ্যাস কর। সত্যের অনুরোধে সমাজের মধ্যে পরিবারের মধ্যে প্রতিদিন সহস্র ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। উদ্দাম মনকে মাঝে মাঝে কঠোর রশ্মি দ্বারা সংযত করিয়া বলিতে হইবে, আমার ভাল লাগিতেছে না বলিয়াই যে অমুক কাজ বাস্তবিক ভাল নয় তাহা না হইতেও পারে, আমার ভাল লাগিতেছে বলিয়াই যে অমুক জিনিষ বাস্তবিক ভাল তাহা কে বলিল? পাঁচ জনে বলিতেছে বলিয়াই যে এইটে ভাল, এতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে ওইটে ভাল তাহাও নয়। এইরূপ প্রতিদিন প্রত্যেক পারিবারিক ও সামাজিক কাজে কর্ত্তব্যানুরোধে আপনাকে দমন করিয়া ও লোকভয় বিসর্জ্জন দিয়া চলিলে প্রতিদিন সত্যকে সত্য বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে শিখিব, জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত সত্যের সহবাসে যাপন করিয়া সত্যের প্রতি আমাদের প্রেম বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, তখন সেই প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন করা সহজ ও সুখকর হইয়া উঠিবে। আর, যাহারা শিশুকাল হইতে সংসারে প্রতিদিন কেবল আপনার সুখ ও পরের মুখ চাহিয়া কাজ করিয়া

আসিতেছে, সুবিজ্ঞ পিতামাতা আত্মীয় স্বজনদের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া প্রতি নিমেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছলনা ও ভীরু আত্মগোপন অভ্যাস করিয়া আসিতেছে, তাহারা কি সহসা একদিন সেই বিপুল মিথ্যাপঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নির্ম্মল সত্যের জন্য সমাজের রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে পারিবে! তাহাদের সত্যনিষ্ঠা কি কখনও এতদূর বলিষ্ঠ থাকিতে পারে!

মিথ্যাপরায়ণ বাঙ্গালী তবে কি বাস্তবিক সত্যের জন্য সংগ্রাম করিবে! চতুর্দ্দিকে এই যে কলরব শুনা যাইতেছে, এ কি বাস্তবিক রণসঙ্গীত! নিদ্রিত বাঙ্গালী তবে কি সত্য সত্যই সত্যের মর্ম্মভেদী আহ্বান শুনিয়াছে! এ কথা বিশ্বাস হয় না। যদি বা আমরা সংশয়গ্রস্ত ভীত দুর্ব্বলচিত্ত রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়াই যুদ্ধ করিতে পারিব না, বিঘ্ন বিপদ দেখিলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িব, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিব। যে বাঙ্গালী স্বজাতিকে স্পষ্ট উপদেশ দেয় যে, ছলনা আশ্রয় করিয়া গোপনে অথাদ্যখাদন প্রভৃতি সমাজবিরুদ্ধ কাজ করিলে কোন দোষ নাই, প্রকাশ্যে করিলেই তাহা দূষণীয়, যে বাঙ্গালী এই উপদেশ অসঙ্কোচে শুনিতে পারে, এবং যে বাঙ্গালী কাজেও এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে সে বাঙ্গালী কখনও ধর্ম্মযুদ্ধের আহ্বানে উত্থান করিবে না! তাহারা দলাদলি গালাগালি ঝগড়াঝাঁটি তর্কবিতর্ক এ সকল কার্য্য পরম উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিবে, কপট কৃত্রিম মিথ্যা কথা সকল অত্যন্ত সহজে উচ্চারণ করিবে—তদূর্দ্ধে আর কিছুই নয়। এ কথা কি কাহাকেও বলিতে হইবে যে, বাঙ্গালীদের একমাত্র বিশ্বাস সেয়ানামীর উপরে! প্রবাদ আছে, "হুজুতে বাঙ্গালী।" বাঙ্গালী মনে করে যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম না করিয়াও গোলেমালে কাজ সারিয়া লওয়া যায়, বীজ রোপন না করিয়াও কৌশলে ফললাভ করা যায়, তেমন ফন্দী করিতে পারিলে মিথ্যার দ্বারাও সত্যের কাজ আদায় করা যাইতে পারে। এই জন্য বাঙ্গালী কাগজ লইয়া দাম দেয় না, দাম লইয়া কাগজ দেয় না, কাজ না করিয়াও দেশহিতৈষী হইয়া উঠে, বিশ্বাস করে না তবু লেখে ও এই উপায়ে মিথ্যা কথা বলিয়া অর্থ সঞ্চয় করে। বাঙ্গালীর জীবনটা কেবল গোঁজা-মিলন। যেখানে সহজে ফাঁকি চলে সেখানে বাঙ্গালী ফাঁকি দিবেই। এইরূপে পৃথিবীকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালী প্রতিদিন বঞ্চিত হইতেছে!

কেবলি কি বাঙ্গালীকে মিষ্ট মিথ্যাকথা সকল বলিতে হইবে? কেবলি বলিতে হইবে, আমরা অতি মহৎজাতি, আমরা আর্য্য শ্রেষ্ঠ, ইংরাজেরা অতি হীন, উহারা ম্লেচ্ছ যবন! আমরা সকল বিষয়েই উপযুক্ত, কেবল ইংরেজেরাই আমাদিগকে ফাঁকি দিতেছে! বলিতে হইবে ইংরেজ সমাজ স্বেচ্ছাচারিতার রসাতলে গমন করিয়াছে, আর আমাদের আর্য্যসমাজ উন্নতির এমনি চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল যে, তদূর্দ্ধে আর এক ইঞ্চি উঠিবার স্থান ছিল না, তাহাতে আর একতিল পরিবর্ত্তন চলিতে পারে না! এই উপায়ে ক্ষুদ্রের অহঙ্কার ক্রমিক পরিতৃপ্ত করিয়া কি "পপুলার" হইতেই হইবে! আমরা যে কত ক্ষুদ্র তাহা আমরা জানি না, সেইটেই আমাদের জানা আবশ্যক। আমরা যে কত মস্ত লোক তাহা ক্রমাগতই চতুর্দ্দিক হইতে শুনা যাইতেছে। কর্ণ জুড়াইয়া নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, সুখ স্বপ্নে আপন ক্ষুদ্রত্বকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখাইতেছে! এখন মিথ্যাকথা সব দূর কর, একবার সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর! অন্য জাতির কেন উন্নতি হইতেছে এবং আর্য্য শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীজাতিরই বা কেন অবনতি হইতেছে, তাহা ভাল করিয়া দেখ। আমাদের মজ্জার মধ্যে কি হীনত্ব আছে, আমাদের শাস্ত্রের কোন্ মর্ম্মস্থলে ঘুন ধরিয়াছে যাহাতে আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইল তাহা ভাল করিয়া দেখ। ইংরেজ সমাজের মধ্যে এমন কি গুণ আছে, যাহার ফলে এমন উন্নত সাহিত্য, এমন সকল বীর পুরুষ, স্বদেশপ্রেমী, মানবহিতৈষী, জ্ঞান ও প্রেমের জন্য আত্মবিসর্জ্জনতৎপর নরনারী ইংরেজ সমাজে জন্মলাভ করিতেছে, আর আমাদের সমাজের মধ্যেই বা এমন কি গুরুতর দোষ আছে যাহার ফলে এমন সকল অলস, ক্ষুদ্র, স্বার্থপর, পল্লবগ্রাহী, মিথ্যা অহঙ্কার পরায়ণ সন্তান সকল জন্মগ্রহণ করিতেছে, সত্যজিজ্ঞাসু হইয়া অপক্ষপাতিতার সহিত তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। ইহাতে উপকার হইতে পারে। আর, আমরাই ভাল এবং ইংরেজেরাই মন্দ ইহা ক্রমাগত বলিলে ও ক্রমাগত শুনিলে ক্রমাগতই মিথ্যা প্রচার ছাড়া আর কোন ফল লাভ হইবে না।

সত্য কথা বলা ভাল আজ আমার এই কথা সকলের পুরাতন ঠেকিতেছে। সত্য চিরদিনই নূতন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে, দুর্ব্বলতাবশতঃ পুরাতন হইয়া যায়। সত্যকে যতক্ষণ সত্য বলিয়া অনুভব করিতে থাকি ততক্ষণ তাহা নূতন থাকে, কিন্তু যখন মনের অসাড়তা বশতঃ আমরা সত্যকে কেবল মাত্র মানিয়া লই অথচ মনের মধ্যে অনুভব করিতে পারি না তখন তাহার অর্দ্ধেক সত্য চলিয়া যায়, সে প্রায় মিথ্যা হইয়া উঠে। যে শব্দ আমরা ক্রমাগত শুনি, অভ্যাসবশতঃ

তাহা আর শুনিতে পাই না, তাহা নিঃশব্দতারই আকার ধারণ করে। এই কারণে পুরাতন সত্য সকলে শুনিতে পায় না, এই কারণে পুরাতন সত্য সকলে বলিতে পারে না। মহাপুরুষেরাই পুরাতন সত্য বলিতে পারেন—বুদ্ধ খৃষ্ট চৈতন্যেরাই পুরাতন সত্য বলিতে পারেন। সত্য তাঁহাদের কাছে চিরদিন নূতন থাকে কারণ সত্য তাঁহাদের যথার্থ প্রিয়ধন। আমরা যাহাকে ভাল বাসি সে কি আমাদের কাছে কখনও পুরাতন হয়! তাহাকে কি প্রতি নিমেষেই নূতন করিয়া অনুভব করি না? প্রথম সাক্ষাতেও নেত্র যেমন অসীম তৃপ্তি অথবা অপরিতৃপ্তির সহিত তাহার মুখের প্রতি আবদ্ধ থাকিতে চায়, দশ বৎসর সহবাসের পরেও কি নেত্র সেই প্রথম আগ্রহের সহিত তাহাকেই চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে থাকে না? সত্য মহাপুরুষদের পক্ষে সেইরূপ চিরনূতন প্রিয়বস্তু! আমার কি তেমন সত্যপ্রেম আছে যে, আজ এই পুরাতন যুগে, মানব-সভ্যতা প্রাদুর্ভাবের কত সহস্র বৎসর পরে পুরাতন সত্যকে নূতন করিয়া মানব-হৃদয়ে জাগ্রত করিতে পারিব!

যাহারা সহজেই সত্য বলিতে পারে তাহাদের সে কি অসাধারন ক্ষমতা! যাহারা হিসাব করিয়া পরম পারিপাট্যের সহিত সত্য রচনা করিতে থাকে, সত্য তাহাদের মুখে বাধিয়া যায়, তাহারা ভরসা করিয়া পরিপূর্ণ সত্য বলিতে পারে না। রামপ্রসাদ ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত হইয়া যেরূপ আত্মীয় অন্তরঙ্গের ন্যায় ঈশ্বরের সহিত মান অভিমান করিয়াছেন, আর কেহ কি দুঃসাহসিকতায় ভর করিয়া সেরূপ পারে! অন্য কেহ হইলে এমন এক জায়গায় এমন একটা শব্দ প্রয়োগ, এমন একটা ভাবের গলদ্ করিত, যে তৎক্ষণাৎ সে ধরা পড়িত। অনুভব করিয়া বলিলে সত্য কেমন সহজে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়া ধরা দেয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে। প্রাচীন ঋষি সরল হৃদয়ে যে প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়াছিলেন "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতঙ্গময়, আবীরাবীর্ম্মএধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" অপরূপ নিয়মে হীরক যেমন সহজেই হীরক হইয়া উঠে, এই প্রার্থনা তেমনি সহজে ঋষিহৃদয়ে উজ্জ্বল আকার ধারণ করিয়া উদিত হইয়াছিল; আজ যদি কেহ হিসাব করিয়া এই প্রার্থনার ভাব-সংশোধন করিতে বসেন, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে, হয়ত তাহাতে এই প্রার্থনা-স্থিত সত্যের সহজ উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যায়। "রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর" প্রার্থনার এই অংশটুকু পরিবর্ত্তন করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।" এইরূপে ঋষিদিগের এই প্রাচীন প্রার্থনার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া তাহাতে একটি নূতন ভাব তালি দিয়া লাগান' হইয়াছে—কিন্তু এ কি বাস্তবিক সংশোধন হইল? সরল-হৃদয় ঋষি কি মিথ্যা বলিয়াছিলেন? এই প্রার্থনায় ঈশ্বরকে যে রুদ্র বলা হইয়াছে সত্যপরায়ণ ঋষির মুখ দিয়া অতি সহজে এই সম্বোধন বাহির হইয়াছে। অসত্য, অন্ধকার, মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়াই ঋষি ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার মনের এই বিশ্বাস ব্যক্ত হইতেছে যে, সত্য আছে, জ্যোতি আছে, অমৃত আছে। এই বিশ্বাসে ভর করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন "রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ"—এমন আশ্বাসবাণী আর কি হইতে পারে, এমন মাভৈঃ ধ্বনি শুনিতেছি আমাদের আর ভয় কি! যে ঋষি অসত্যের মধ্যে সত্য, অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতি, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত দেখিয়াছেন, তিনিই রুদ্রের দক্ষিণ মুখ দেখিয়াছেন, এবং সেই আনন্দবারতা প্রচার করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন ভয়ের মধ্যে অভয়, শাসনের মধ্যে প্রেম বিরাজ করিতেছে। এখানে "দয়াময়" বলিলে এত কথা ব্যক্ত হয় না, সে কেবল একটা কথার কথা হয় মাত্র। তাহাতে রুদ্র ভাবের মধ্যেও প্রসন্নতা, আপাতপ্রতীয়মান অমঙ্গল রাশির মধ্যেও সরল হৃদয়ে মঙ্গল স্বরূপের প্রতি দৃঢ় নির্ভর এমন সুন্দররূপে ব্যক্ত হয় না। মহর্ষি এতশত ভাবিয়া বলেন নাই, ঈশ্বরের প্রসন্ন দক্ষিণমুখ দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াই তিনি নির্ভয়ে ঈশ্বরকে রুদ্র বলিতে পারিয়াছেন, তাঁহার মুখ দিয়া সত্য অবাধে বাহির হইয়াছে আর আমরা বিস্তর তর্ক করিয়া যুক্তি করিয়া তাহার একটি কথা পরিবর্ত্তন করিলাম., তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা নষ্ট হইয়া গেল।

ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, সত্য বলা সহজ নয়। ইস্কুলের পড়ার মত সত্য মুখস্থ করিয়া সত্য বলা যায় না! সত্যের প্রতি ভালবাসা আগে সাধনা করিতে হইবে, ভালবাসার দ্বারা সত্যকে বশ করিতে হইবে, সংসারের সহস্র কুটিলতার মধ্যে হৃদয়কে সরল রাখিতে হইবে তার পরে সত্য বলা সহজ হইবে। কেবল যদি লোভ ক্রোধ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সকল আমাদের সত্যপথের বাধা হইত, তাহা হইলেও আমাদের তত ভাবনার কারণ ছিল না। কিন্তু আমাদের অনেক সুপ্রবৃত্তিও আমাদিগকে সত্যপথ হইতে বিচলিত করিবার জন্য আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের আত্মানুরাগ, দেশানুরাগ, লোকানু-

রাগ অনেক সময়ে আমাদিগকে সত্যভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে থাকে, এই জন্যই সত্যানুরাগকে এই সকল অনুরাগের উপরে শিরোধার্য্য করা আবশ্যক।

আমার আর সকল কথা লোকের বিরক্তিজনক পুরাতন ঠেকিতে পারে কিন্তু আমার একটি কথা পুরাতন হইলেও বোধ করি অনেকের কর্ণে অত্যন্ত নূতন ঠেকিতেছে। আমি বলিতেছি, সত্য কথা বল, সত্যাচরণ কর, কারণ দেশের উন্নতি তাহাতেই হইবে। এ কথা সচরাচর শুনা যায় না। কথাটা এত অল্প, এত শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, এবং এমন প্রাচীন ফেষানের যে, কাহারো বলিয়া সুখ হয় না, শুনিতে প্রবৃত্তি হয় না, ইহাতে সুগভীর চিন্তাশীলতা বা গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় না, ইহাতে এমন উদ্দীপনা উত্তেজনা নাই যাহাতে করতালি আকর্ষণ করিতে পারে। দেশহিতৈষিরা কেহ বলেন দেশের উন্নতির জন্য জিম্‌ন্যাষ্টিক কর, কেহ বলেন সভা কর, আন্দোলন কর, ভারত-সঙ্গীত গান কর, কেহ বলেন মিথ্যা বল মিথ্যা প্রচার কর কিন্তু কেহ বলিতেছেন না সত্য কথা বল ও সত্যানুষ্ঠান কর। উপরিউক্ত সকল ক'টার মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে বলা সহজ এবং সকলের চেয়ে করা শক্ত, এইটেই সকলের চেয়ে আবশ্যক বেশী, এবং সকলের চেয়ে অধিক উপেক্ষিত। সত্য সকলের গোড়ায় এবং সত্য সকলের শেষে, আরম্ভে সত্যবীজ রোপন করিলে শেষে সত্য ফল পাওয়া যায়, মিথ্যায় যাহার আরম্ভ মিথ্যায় তাহার শেষ। আমরা যে ভীত সঙ্কুচিত সংশয়গ্রস্ত ক্ষুদ্র ধূলিবিহারী কীটাণু হইয়াছি ইংরেজের মিথ্যা নিন্দা করিলে আমরা বড় হইব না, আপনাদের মিথ্যা প্রশংসা করিলেও আমরা মস্ত হইব না। আমরা যে পরস্পরকে ক্রমাগত সন্দেহ করি, অবিশ্বাস করি, দ্বেষ করি, মিলিয়া কাজ করিতে পারি না, পরের স্তুতি পাইবার জন্য হাঁ করিয়া থাকি, কথায় কথায় আমাদের দল ভাঙ্গিয়া যায়, কাজ আরম্ভ করিতে সংশয় হয়, কাজ চালাইতে উৎসাহ থাকে না, আমরা যে ক্ষুদ্রতা লইয়া থাকি, খুঁটিনাটি লইয়া মান অভিমান করি, মুখ্য ভুলিয়া গিয়া গৌণ লইয়া অশিক্ষিতা মুখরার ন্যায় বিবাদ করিতে থাকি, আড়ালে পরস্পরের নিন্দা করি, সম্মুখে দোষারোপ করিতে অত্যন্ত চক্ষুলজ্জা হয়, তাহার কারণ আমরা মিথ্যাচারী, সত্যের প্রভাবে সরল ও সবল নহি, উদার উৎসাহী ও বিশ্বাসপরায়ণ নহি। আমরা যে আগাটায় জল ঢালিতেছি, তাহার গোড়া নাই, নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতেছি কিন্তু তাহার মূলে সত্য নাই, এই জন্য ফল লাভ হইতেছে না। যেমন, যে রাগিণীতে যে গান গাওনা কেন একটা বাঁধা সুর অবলম্বন করিতে হইবে, সেই এক সুরের প্রভাবে গানের সকল সুরের মধ্যে ঐক্য হয়, নানা বিভিন্ন সুর এক উদ্দেশ্য সাধন করিতে থাকে, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করে না, তেমনি আমরা যে কাজ করি না কেন সত্যকে তাহার মূল সুর ধরিতে হইবে। আমরা সেই মূল সুর ভুলিয়াছি বলিয়াই এত কলরব হইতেছে, ঐক্য ও শৃঙ্খলার এত অভাব দেখা যাইতেছে। এত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও সকলে কোলাহলই উত্তেজিত করিতেছেন, কেহ মূল সুরের প্রতি লক্ষ্য করিতে বলিতেছেন না, তাহার কারণ ইহার প্রতি সকলের তেমন দৃঢ় আস্থা নাই—ইহাকে তাঁহারা অলঙ্কারের হিসাবে দেখেন নিতান্ত আবশ্যকের হিসাবে দেখেন না। পেট্রিয়টেরা দেশের উন্নতির জন্য নানা উপায় দেখিতেছেন, নানা কৌশল খেলিতেছেন। এ দিকে মিথ্যা নীরবে আপনার কার্য্য করিতেছে, সে ধীরে ধীরে আমাদের চরিত্রের মূল শিথিল করিয়া দিতেছে, সে আমাদের পেট্রিয়ট্‌দিগের কোলাহলময় ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র খাতির করিতেছে না। পেট্রিয়টেরা পদ্মার তীরে দুর্গ নির্ম্মাণে মত্ত হইয়াছেন, কিন্তু মায়াবিনী পদ্মা তাহার অবিশ্রাম খরস্রোতে তলে তলে তটভূমি জীর্ণ করিতেছে। তাই মাঝে মাঝে দেখিতে পাই আমাদের পেট্রিয়টদিগের বিস্তৃত আয়োজন সকল সহসা এক-রাত্রের মধ্যে স্বপ্নের মত অন্তর্ধান করে। যেখানে জাতীয় চরিত্রের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে, সেখানে যে পাঁচ জন পেট্রিয়টে মিলিয়া জোড়াতাড়া, তালি, ঠেকো প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া কৌশল খেলাইয়া স্থায়ী কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন এমন আমার বিশ্বাস হয় না। অনন্তের অমোঘ নিয়মকে কৌশলের দ্বারা ঠেলিবে কে? যেখানে সত্য সিংহাসনচ্যুত হওয়াতে অরাজকতা ঘটিয়াছে, সেখানে চাতুরী আসিয়া কি করিবে! হায়, দেশ উদ্ধারের জন্য সত্যকে কেহই আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন না! চিরনবীন চির-বলিষ্ঠ সত্যকে বুদ্ধিমানেরা অতি প্রাচীন বলিয়া অব-হেলা করিতেছেন! কিন্তু যাঁহারা জীবন নূতন আরম্ভ করিয়াছেন, যৌবনের পূত হুতাশন যাঁহাদের হৃদয়কে উদ্দীপ্ত ও উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছে যাহার সহস্র শিখা দীপ্ত তেজে মহত্ত্বের দিকেই অবিশ্রাম অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে, যাঁহারা বিষয়ের মিথ্যাজালে জড়িত হন নাই, মিথ্যা যাঁহাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অভ্যস্ত হইয়া যায় নাই, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করুন প্রার্থনা করুন যেন সত্যপথে চিরদিন অটল থাকিতে পারেন, তাহা হইলে অমর যৌবন লাভ করিয়া তাঁহারা পৃথিবীর কাজ করিতে পারিবেন। মিথ্যাপরায়ণ বিজ্ঞ-

তার সঙ্গে সঙ্গেই জরাগ্রস্ত বার্দ্ধক্য আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে, আমাদের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়, আমাদের প্রাণের দৃঢ় সূত্র সকল শিথিল হইয়া পড়ে, সংশয় ও অবিশ্বাসের প্রভাবে মাংস কুঞ্চিত হইয়া যায়। আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে বাহির হইব যে, মিথ্যার জয় দেখিলেও আমরা সত্যকে বিশ্বাস করিব, মিথ্যার বল দেখিলেও আমরা সত্যকে আশ্রয় করিব, মিথ্যার চক্রান্ত ভেদ করিবার উদ্দেশে মিথ্যা অস্ত্র ব্যবহার করিব না। আমরা জানি শাস্ত্রেও মিথ্যা আছে, চিরন্তন প্রথার মধ্যেও মিথ্যা আছে, আমরা জানি অনেক সময়ে আমাদের হিতৈষী আত্মীয়েরা মিথ্যাকেই আমাদের যথার্থ হিতজ্ঞান করিয়া জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ আমাদিগকে মিথ্যা উপদেশ দিয়া থাকেন। সত্যানুরাগ হৃদয়ের মধ্যে অটল রাখিয়া এই সকল মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। সত্যানুরাগ সত্ত্বেও আমরা ভ্রমে পড়িব, কিন্তু সেই ভ্রম সংশোধন হইবে, সেই ভ্রমই আমাদিগকে পুনরায় সত্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র প্রথানুরাগ বা শাস্ত্রানুরাগ বশতঃ যখন ভ্রমে পড়ি তখন সে ভ্রম হইতে আর আমাদের উদ্ধার নাই, তখন ভ্রমকে আমরা আলিঙ্গন করি, মিথ্যাকে প্রিয় বলিয়া বরণ করি, মিথ্যা প্রাচীন ও পূজনীয় হইয়া উঠে, পূর্ব্ব পুরুষ হইতে উত্তর পুরুষে সযত্নে সংক্রামিত হইতে থাকে, এইরূপ সমাদর পাইয়া বিনাশের বীজ মিথ্যা আপন আশ্রয়ের স্তরে স্তরে শিকড় বিস্তার করিতে থাকে অবশেষে সেই জীর্ণ জর্জ্জর মন্দিরকে সঙ্গে করিয়া ভূমিসাৎ হয়। আমাদের এই দুর্দ্দশাপন্ন ভারতবর্ষ সেই ভূমিসাৎ জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। কালক্রমে বন্ধন-জর্জ্জর সত্য এই ভারতবর্ষে এমনি হীনাসন প্রাপ্ত হইয়াছিল যে গুরু, শাস্ত্র এবং প্রথাই এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিল; স্বর্গীয় স্বাধীন সত্যকে গুরু, শাস্ত্র এবং প্রথার দাসত্বে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। মিথ্যা উপায়ের দ্বারা সত্য প্রচার করিবার ও সহস্র মিথ্যা অনুশাসন দ্বারা সত্যকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। বুদ্ধিমানেরা বলিয়া থাকেন, মিথ্যার সাহায্য না লইলে সাধারণের নিকটে সত্য গ্রাহ্য হয় না, এবং মিথ্যা বিভীষিকা না দেখাইলে দুর্ব্বলেরা সত্য পালন করিতে পারে না। মিথ্যার প্রতি এম্‌নি দৃঢ় বিশ্বাস! ইতিহাসে পড়া যায় বিলাসী সভ্য জাতি বলিষ্ঠ অসভ্য জাতিকে আত্মরক্ষার্থ আপন ভৃত্য শ্রেণীতে নিযুক্ত করিত, ক্রমে অসভ্যেরা নিজের বল বুঝিতে পারিয়া মনিব হইয়া দাঁড়াইল। তেমনি সত্যকে রক্ষার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করাতে ক্রমে মিথ্যাই মনিব হইয়া দাঁড়াইল—সত্যকে মিথ্যার দ্বারস্থ হইতে হইল। সত্যের এইরূপ অবমান দশায় শত সহস্র মিথ্যা আসিয়া আমাদের হিন্দুসমাজে হিন্দুপরিবারে নির্ভয়ে আশ্রয় লইল কেহ তাহাদিগকে রোধ করিবার রহিল না তাহার ফল এই হইল সত্যকে দাস করিয়া আমরা মিথ্যার দাসত্বে রত হইলাম, দাসত্ব হইতে গুরুতর দাসত্বে উত্তরোত্তর নামিতে লাগিলাম, আজ আর উত্থান শক্তি নাই—আজ পঙ্গুদেহে পথপার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া কাতর স্বরে বলিতেছি "দেও বাবা ভীখ্ দেও!"

বালক, চৈত্র।

নব-বর্ষের গান।

ভৈরোঁ। ঝাঁপতাল।

আমারেও কর মার্জ্জনা।
আমারেও দেহ নাথ অমৃতের কণা।
গৃহ ছেড়ে পথে এসে, বসে আছি ম্লান বেশে,
আমারো হৃদয়ে কর আসন রচনা।
জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান,
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান।
আপনি ডুবেছি পাপে কাঁদিতেছি মনস্তাপে
শুনগো আমারো এই মরম-বেদনা।

ললিত। আড়াঠেকা।

বর্ষ গেল, বৃথা গেল, কিছুই করিনি হায়,
আপন শূন্যতা লয়ে, জীবন বহিয়া যায়।
তবুত আমার কাছে, নব রবি উদিয়াছে,
তবুত জীবন ঢালি বহিছে নবীন বায়।
বহিছে বিমল উষা তোমার আশীষ বাণী,
তোমার করুণা-সুধা হৃদয়ে দিতেছে আনি।
রেখেছ জগত-পুরে, মোরেত ফেলনি দূরে,
অসীম আশ্বাসে তাই পুলকে শিহরে কায়।

টোড়ি-ভৈরবী। আড়াঠেকা।

ফিরোনা ফিরোনা আজি, এসেছ দুয়ারে,
শূন্য হাতে কোথা যাও শূন্য সংসারে।
আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আনগো ডেকে,
অমৃত ভরিয়া লও মরম মাঝারে।
শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রেখে কার পানে চাও—
শূন্য দুটো কথা শুনে কোথা চলে যাও।
তোমার কথা তাঁরে কয়ে তাঁর কথা যাও লয়ে,
চলে যাও, তাঁর কাছে রেখে আপনারে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

বর্ষ-শেষ ব্রাহ্মসমাজ।

পৃথিবী আত্মার পালন ও পোষণ-ক্ষেত্র। কৃষক বীজকে অঙ্কুরিত করিবার জন্য যেমন প্রথমে ক্ষুদ্রায়তন ভূমিখণ্ডে তাহাকে বপন করে; তৎপরে জলবায়ু আলোক প্রদানে তাহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া ক্ষেত্রান্তরে রোপণ করিয়া থাকে, করুণাময় পরমেশ্বর তেমনই পৃথিবীরূপ উর্ব্বর ক্ষেত্রে মানব আত্মাকে রক্ষা করিয়া এখানকার জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতি পবিত্রতায় শিক্ষিত ও উন্নত করিয়া ক্রমে তাহাকে লোকলোকান্তরের উপযুক্ত করিয়া লন। কৃষক যেমন মৃত্তিকার মধ্যে বীজ নিহিত করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত নহে, যতকাল না তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ক্ষুদ্র বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, ততদিনই যথানিয়মে বারিসেচন ও বাতাতপ প্রদান বিষয়ে সুব্যবস্থা করিয়া থাকে, সেইরূপ অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর বিশাল সংসারের মধ্যে ক্ষুদ্রায়তন দেহাভ্যন্তরে অমর আত্মাকে নিহিত করিয়া দিয়া এমনই অনুকূল বিষয়-ব্যাপারের ভিতরে এমন ভাবে তাহাকে সংস্থাপন করিয়াছেন, যে সে সহজে জ্ঞানের আলোক, ধর্ম্মের সুস্নিগ্ধ ছায়ায় আত্মা পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমে পরলোকের উপযুক্ত হয়। কৃষিকার্য্যে কৃষকের যত্ন চেষ্টা থাকিলেও যেমন সুবৃষ্টির অপেক্ষা থাকে তেমনি উন্নতিশীল স্বাধীন আত্মার স্বীয় উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য তাহার আত্মচেষ্টা আত্মবল থাকিলেও তাহার সার্ব্বভৌমিক উন্নতির নিমিত্ত দেব-প্রসাদের নিতান্ত প্রয়োজন। ঈশ্বর সেই জন্য তাঁহার অতুলন জ্ঞান প্রেম-ছটা প্রকৃতি-পটে নিয়তই বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, দুর্লভ প্রসাদবারি অকাতরে মানব আত্মার উপরে অজস্রধারে প্রতিনিয়তই বর্ষণ করিতেছেন, জ্ঞান প্রেম দয়াধর্ম্ম প্রতিক্ষণই বিতরণ করিতেছেন, এবং তাহার অনন্ত উন্নতিসাধনের পরমোৎকৃষ্ট আদর্শরূপে আপনাকে তাহার হৃদয়াকাশে নিয়তই প্রকাশ করিতেছেন। বৃক্ষবাটিকা যেরূপ বৃক্ষের পূর্ণবিকাশের স্থান নহে, কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইলেই যেমন তাহা ক্ষেত্রান্তরে নীত ও রোপিত হয় এবং কালক্রমে ফলফুলে শোভিত হইয়া দিক্‌বিতান আলোকিত করে, সেইরূপ মানব আত্মার পূর্ণ উন্মেষ-ক্ষেত্র এই পৃথিবী নহে। পৃথিবীর শিক্ষাসাধন জ্ঞান প্রেম আত্মাকে প্রীতি পবিত্রতা, শান্তি সদ্ভাবের ফলফুলে চিরশোভিত করিতে পারে না। সে এখানে যথো-

চিত উন্নত ও বর্দ্ধিত হইলে আবার উচ্চতর শিক্ষা ও মহত্তর উন্নতি সাধনের জন্য লোকান্তরে নীত হয়।

পার্থিব কীট পতঙ্গ যেমন বর্দ্ধন-উন্মুখ বৃক্ষলতার শ্রী সৌন্দর্য্য বিনাশ করে তেমনি এখানকার পাপ তাপ উন্নতিশীল আত্মার শ্রীসৌষ্ঠব বিরূপ ও বিকৃত করিয়া দেয়। তাহারদের উপদ্রব অত্যাচারে আত্মা এখানে মৃতকল্প হইয়া পড়ে, তাহার স্ফূর্ত্তি উদ্যম তিরোহিত হইয়া যায়। আকাশ হইতে চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতি, সূর্য্যের মঙ্গল কিরণ মেঘের সুস্নিগ্ধ বারিধারা প্রাপ্ত হইলে যেমন বৃক্ষলতা প্রাণ পায়, তেমনি অন্তরাকাশ হইতে জ্ঞান প্রেম সত্য মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বরের অমৃত-জ্যোতি—প্রেম-ধারা আত্মাতে পতিত হইলে তবে তাহার পাপতাপ মোহ-কুজ্ঝটিকা অন্তরিত হয়। তাহার উন্নতি-পথের বিঘ্ন-বিপত্তিসকল বিদূরিত হইয়া যায়। তখনই সে নবতর কল্যাণতর লোকের জন্য এখানে উপযুক্ত হইবার বলশক্তি লাভ করে।

কৃষক যেমন ক্ষুদ্র বৃক্ষবাটিকার নবজাত বৃক্ষকে বদ্ধমূল হইতে দেয় না, ফলতঃ যাহাতে তাহার শিকড় সকল মৃত্তিকার গভীর প্রদেশে প্রবেশ না করে তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকে; তেমনি যাহাতে আমারদের আত্মা এই সংকীর্ণ সংসারে নিমগ্ন হইয়া না পড়ে, পার্থিব সুখে আমারদের আত্মা আকৃষ্ট না হয়, স্ত্রী-পুত্র পরিবারের মায়ার শতবন্ধনে জড়িত হইয়া না যায়, অনন্ত উন্নত ধামের যাত্রী হইয়া এককালে পৃথিবীতেই আশা ভরসা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া না ফেলে, তজ্জন্য করুণাময় ঈশ্বর সর্ব্বদাই স্নেহ-দৃষ্টিতে আমাদিগকে দেখিতেছেন। সেই কারণেই বিপথগামী হইলে কখন রুদ্রমূর্ত্তি দেখাইয়া আমাদিগকে সতর্ক ও সাবধান করিতেছেন, কখন দুঃখের কঠিন কশাঘাতে আমাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতেছেন। কখন বা প্রেমের আলিঙ্গন দিয়া আমারদের আত্মার শতগুণ বল বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছেন। কখন বা হৃদয়বিমোহন প্রেমের প্রতিমা স্নেহের পুত্তলিকা সকলকে অন্তরিত করিয়া দিয়া, আমাদের মোহ-অন্ধকার বিনষ্ট করত জাগ্রত করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সম্পাদনে আমারদিগকে দৃঢ়ব্রত করিয়া তুলিতেছে। দেশ কালের মধ্যে থাকিয়া ঘটনাপটে যখন তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের অভিনয় দেখিতে পাই, তখনই বুঝিতে পারি যে আমরা সংসারের জীব নহি, বিনশ্বর পার্থিব পদার্থপুঞ্জ আমারদের চিরতৃপ্তি-প্রদ উপাদান নহে, আমারদের তৃপ্তি-স্থল ঈশ্বর, আমারদের প্রাণারাম পরব্রহ্ম। তখন বুঝিতে পারি যাহা কিছু তিনি প্রেরণ করেন, তাহাই আমারদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য। তখন আমরা কেবলমাত্র তাঁহাকেই আমারদের সর্ব্বস্ব ও ঐহিক পারত্রিক সুখ সম্পত্তির কারণ জানিয়া নির্ভয় হই। সংসার আমারদের সর্ব্বস্ব নহে, আমরা ব্রহ্মধামের যাত্রী, অনন্ত কাল শত শত বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া আমারদিগকে তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। পৃথিবী সেই পথের একটি সামান্য পান্থ-নিবাস মাত্র। তখনই নিরাশার মধ্যে আশা পাই, শোকের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করি, সংসার-প্রহেলিকার গূঢ় ধর্ম্ম অবধারণে সমর্থ হই এবং ভয় বিপদের মধ্যে তাঁহার অভয় হস্ত দেখিতে পাইয়া লৌহবর্ম্মে হৃদয়কে আবৃত করি। হা! ঈশ্বরের কি করুণা! তিনি দীন হীন ক্ষুদ্র আত্মাকে কত উপায়ে যে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন তাহা কে বলিবে!

বৃক্ষের মূল যেমন ভূপৃষ্ঠে, আত্মার মূল তেমনই ঊর্দ্ধদেশে, আত্মা উত্তান-পাদ,

ঈশ্বর হইতে ইহার উৎপত্তি, আবার ঈশ্বরের দিকেই ইহার গতি, আত্মা ভূলোক হইতে দেবলোকে, দেবলোক হইতে উচ্চতর লোকে ক্রমাগতই বিমলতর পবিত্রতর হইয়া নির্ম্মল শাশ্বত সুখ উপভোগের জন্য সেই সুখের অনন্ত প্রস্রবণের প্রতি ধাবিত হইতেছে। মানব আত্মা সেই অনির্ব্বচনীয় সুখের ভিখারী বলিয়াই সাংসারিক সুখে তাহার এত অতৃপ্তি, তাহার ক্ষুৎপিপাসা অধিক বলিয়াই পার্থিব অনিত্য সুখে তাহার শান্তি নাই আরাম নাই। যখনই ভ্রমান্ধ হইয়া সংসার-মরীচিকায় তৃপ্তি লাভ করিতে যায়, তখনই প্রতারিত হয়।

কৃষকের যত্ন চেষ্টার ত্রুটি হইলে যেমন বৃক্ষের চারা শুষ্ক বিশুষ্ক হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ঈশ্বরের স্নেহ প্রেমের প্রতি উদাসীন হইলে তেমনি আত্মার উচ্ছেদ-দশা উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা স্বাধীন জীব হইলেও আমারদের মানসিক বল এতদূর অধিক নহে, যাহাতে পাপ প্রলোভনের প্রতি আক্রমণে বিজয় লাভ করিতে পারি। জ্ঞানের ক্ষীণ আলোকে সকল সময়ে আমরা আমারদের গন্তব্য পথ স্থির করিতে পারি না। রিপুকুলের উত্তেজনায় অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকা আমারদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই জন্যই তাঁহার এই প্রেমরাজ্যে পাপ তাপ বিবাদ কলহ অসূয়া পরনিন্দার দাবানল আমরা নিজেই প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছি।

সম্বৎসর কাল চলিয়া যায়, এই রজনী মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা এক্ষণে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হৃদয় নিরাশায় পূর্ণ হইতেছে। এমন কত সময় বৃথা অতিবাহিত করিয়াছি, যখন তাঁহার দিকে আসিতে চেষ্টা করিলে সহজেই আসিতে পারিতাম, এমন কত সময় আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া দিয়াছি, যখন তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া জীবনকে মধুময় করিতে পারিতাম, ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মনুষ্যজন্মের সার্থক্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতাম। যখন প্রেয়ের আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া তাহার অনুসরণ করিয়াছিলাম, তখন জানিতাম না যে শ্রেয় হইতে এতদূর অন্তরে পতিত হইব ও আপনার উপর এত অধিক পাপ-মলা সঞ্চয় করিব। বাষ্পরথ যে কখন্ এক বর্ত্ম হইতে অন্য বর্ত্মে গমন করে, তাহা যেমন আরোহী অনেক দূর গমন না করিয়া বুঝিতে পারে না, তেমনি আমরা সরল শ্রেয়-পথকে অতিক্রম করিয়া কখন যে কেমন করিয়া প্রেয়ের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। যখন বুঝিলাম যে সেই পুণ্য-পথ হইতে বহুদূর অন্তরে আসিয়া পড়িয়াছি তখন ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন আর প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় দেখিতে পাই না, তাঁহার অমোঘ সাহায্য বিনা পরিত্রাণের আর গত্যন্তর দেখিতে পাই না।

ভবিষ্যতের কি কোন আশা নাই, সে পথ কি নিতান্তই অন্ধকারাচ্ছন্ন? অতীতের পাপতাপ কি ধ্বংস হইবার নহে? আমারদের মৃতবৎ আত্মার কি মৃতসঞ্জীবন ঔষধ কোথাও নাই? আমারদের আত্মা অনন্ত উন্নত ধামের যাত্রী হইয়া অসহায় অবস্থায় এই মহা প্রান্তরে নিপতিত থাকিয়া কি চিরকাল রোদন করিবে, চিরবন্দী ভাবে কি এখানে দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে? না, কখনই না। সেই পাপতাপহারী বিপদকাণ্ডারী আমারদের নিকটে, সেই স্নেহময়ী মাতা, করুণাময় পিতা, যাত্রীবৎসল নেতা আমারদের সম্মুখে। জ্ঞান-

উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে সকলে দর্শন কর, স্থির হৃদয়ে তাঁহার আশাপূর্ণ স্নেহের আহ্বান শ্রবণ কর। তিনি বলিতেছেন "বৎস! নিরাশ হইও না, এই যে আমি তোমার সম্মুখে; কৃত অপরাধ জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত হইয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, আমি তোমাদের পাপ-মলা প্রক্ষালিত করিয়া অমৃত পথে লইয়া যাইব।" আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, আইস আমরা সকলে তাঁহার অমোঘ সাহায্য প্রার্থনা করি।

হে পরমাত্মন্! তুমি যে অমর আত্মার উন্নতি সাধনের গুরুভার যত টুকু আমারদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলে, দেখ আমরা তাহাকে পাপের পঙ্কিল হ্রদে ডুবাইয়া বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় তোমার সিংহাসনের সম্মুখে কম্পিতকলেবরে দণ্ডায়মান হইয়াছি। তুমি সহস্র দণ্ড দাও অম্লানবদনে সহ্য করিব, কিন্তু তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। তোমা হইতে পলায়ন করিয়া আর কোথায় গিয়া রক্ষা পাইব। গিরিগুহা অরণ্য প্রান্তর নগর গ্রাম সকল স্থানেই তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিদ্রোহী প্রজা যেমন রাজার নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়া অভয় প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ আমরা পাপে মলিন শোকে জর্জ্জরিত হইয়া তোমার পদতলে অমর আত্মাকে আনিয়া ধারণ করিতেছি, তুমি তোমার প্রসাদ-বারি সিঞ্চনে তাহার পাপ-মলা ধৌত বিধৌত করিয়া দাও। তুমি তোমার অমৃতময় ক্রোড়ে তাহাকে স্থান দান কর, ধর্ম্মের অভেদ্য কবচে তাহাকে আবৃত করিয়া দাও। তুমি যে আমারদের আশ্রয়, আর আমরা যে তোমার আশ্রিত, তুমি যে আমারদের পিতা, আমরা যে তোমার দীন সন্তান, তুমি যে আমারদের ইহলোকের শরণ্য পরলোকের সুহৃদ, আমরা যে তোমার চির আশ্রিত ও তোমার দ্বারের চিরভিখারী। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, আর কতকাল তোমা হইতে দূরে থাকিব। তুমি যদি কৃপা করিয়া আমারদিগকে দর্শন দিয়াছ আমারদিগকে তোমার সন্নিহিত কর। যাহাতে শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিরন্তর তোমার দিকে অগ্রসর হইতে পারি, বর্ষের পর নববর্ষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে আমারদের আত্মা নবতর কল্যাণতর বেশে তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে, কৃপা করিয়া আমারদিগকে এরূপ ধর্ম্মবল ও শুভবুদ্ধি প্রদান কর। তোমার নিকটে যোড়করে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নব-বর্ষ।

দেখিতে দেখিতে নববর্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আরক্তিম সূর্য্য পূর্ব্বদিকে দণ্ডায়মান হইল, আর আমাদের অন্তরে বাহিরে উৎসবমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে—আমাদের আরাধ্য দেবতা মধ্যস্থলে জ্যোতির্ম্ময় মহিমায় আসীন রহিয়াছেন নিখিল দেবতারা তাঁহার উপাসনা করিতেছেন—আমরাও তাঁহার উপাসনার জন্য এখানে প্রেম ভক্তি সহকারে সম্মিলিত হইয়াছি। তাঁহারই আদেশে প্রত্যেক মাস, প্রত্যেক বৎসর, নূতন নূতন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সমাধা করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে—বৎসরের এই প্রথম প্রাতঃকালের বিমল কিরণ বৃথা চলিয়া না যায়—এই মুখ্য সময়টিকে আইস আমরা কায়মনোবাক্যে আমাদের পরম দেবতার আরাধনায় উৎসর্গ করি—এইরূপ বিশুদ্ধ মনে উৎসর্গ করি যেন সম্বৎসর কাল

আমরা তাহার ফল ভোগ করিতে পারি। প্রাতঃকালের প্রথম জ্যোতির জন্য সরোবরের পদ্ম কেমন লালায়িত হয়, বৎসরের প্রথম মঙ্গল-কিরণের জন্য আমরা সেইরূপ তৃষার্ত্ত হৃদয়ে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি,—এই সময়ে আইস আমরা আমাদের দেবতার দেবতা প্রভুর প্রভু জীবনের জীবন পরমাত্মাকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হই, আজ তিনি আমাদিগকে বৎসরের প্রথম অমৃত ফল বিতরণ করিবার জন্য এখানে আহ্বান করিয়াছেন, আজ আমাদের কত না আনন্দ। পবিত্র সঙ্গীত-ধ্বনিতে আজ আমাদের আত্মার দিব্য চক্ষু বিকসিত হইয়াছে—পরমাত্মাকে আমরা দেখিতেছি—স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ; তিনি অধোতে তিনি উর্দ্ধে তিন পশ্চাতে তিনি সম্মুখে তিনি দক্ষিণে তিনি উত্তরে, ঈশানো ভূতভব্যস্য তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা, স এবাদ্য স উ শ্বঃ তিনি অদ্যও যেমন কল্যও তেমনি, সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তাঁহারই প্রেমের সুদীর্ঘ নিশ্বাস, সমস্ত আকাশ তাঁহারই প্রাণের জীবন্ত উচ্ছ্বাস। হে পরমাত্মন্! তোমার প্রসাদে বসন্ত ঋতু তরু লতার মর্ম্মে মর্ম্মে রস সিঞ্চন করে, গ্রীষ্ম ঋতু সন্ধ্যা-সমীরণে মাধুর্য্য সঞ্চার করে, বর্ষা-ঋতু তপ্ত মেদিনীকে শীতল করে, শরৎ ঋতু দিক্ দিগন্তের মলিন মুখ উজ্জ্বল করে, শীত ঋতু ধরণীকে শস্যশালিনী করে, কিন্তু তোমার প্রেম-সুধার কণামাত্র আমাদের মৃত-শরীরে যেরূপ প্রাণ সঞ্চার করে, আমাদের শুষ্ক হৃদয়কে যেরূপ সরস করে আমাদের আত্মাতে যেরূপ অক্ষয় জীবনের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, জগতে কোথাও তাহার তুলনা নাই। তোমার প্রেম নিখিল জনের নিখিল মঙ্গল—সেই প্রেমের প্রসাদ-বিন্দু আমাদের সম্বৎসরের সম্বল হইবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি—তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা। *

উপক্রমণিকা

তত্ত্বজ্ঞান-শব্দে কিরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত যে-কোন স্থানে তত্ত্বজ্ঞান-শব্দের স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে, সেখানে দর্শন-বিজ্ঞান বলিতে সচরাচর যাহা বুঝায় তাহাই বুঝিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞান বা দর্শন কাহাকে বলে তাহা পরে আপনা-হইতেই প্রকাশ পাইবে—সে জন্য কোন চিন্তা নাই। পূর্ব্বাহ্নে কেবল এই কথাটি বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, তত্ত্বজ্ঞান শব্দের যেরূপ অর্থ এখানে ধরা হইতেছে, তাহার ভিতর ভৌতিক বিজ্ঞান কি গণিত-বিজ্ঞান এ দুয়ের কোনটিই স্থান পাইতে পারে না—উভয়ই তাহার অধিকার-বহির্ভূত।

তত্ত্ব-জ্ঞানের পক্ষে কোন্ দুইটি বিষয় প্রয়োজনীয়।

তত্ত্ব-জ্ঞান-শাস্ত্রের দুইটি হওয়া চাই—(১) সত্য হওয়া চাই এবং (২) যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র যদি সত্য না হয় তবে তাহাতে লোকের বিশ্বাস জন্মিবে কদাচ; যদি তাহা যুক্তি-দ্বারা প্রমাণীকৃত না হয়, তবে সেরূপ শাস্ত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে অধ্যয়ন করিতে দেওয়া, আর, ক্ষুধা-

* অধ্যাপক ফেরিয়ারের কৃত Institutes of Metaphisics.

র্ত্তকে কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিতে দেওয়া, সমান,—তাহা গলাধঃকরণ হওয়াই ভার। সত্য তত্ত্বজ্ঞানের চরম লক্ষ্য; এই জন্য তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র সত্য হওয়া চাই। তেমনি আবার, জ্ঞানের বিকাশ তত্ত্বজ্ঞানের উপস্থিত লক্ষ্য,—তাহা বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনার উপর নির্ভর করে। বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা—অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব হইতে চরম সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত যুক্তির যতগুলি অবয়ব আছে, সমস্তেরই অবধারণ এবং শৃঙ্খলাবন্ধন; এই জন্য তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র যুক্তি-যুক্ত হওয়া চাই। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত আদর্শ ধরিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, তত্ত্বজ্ঞান যুক্তি-যুক্ত সত্যের একটি সন্দর্ভ।

ঐ দুই প্রয়োজনীয় বিষয়ের কোন্‌টি অধিক বলবৎ।

উপরে যে-দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথা বলা হইল (কি না (১) সত্য হওয়া চাই, (২) যুক্তিযুক্ত হওয়া চাই) তাহার মধ্যে শেষোক্তটি অপেক্ষাকৃত বলবৎ। তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে সত্য হওয়া যতই কেন আবশ্যক হউক না—যুক্তি-যুক্ত হওয়া তাহা অপেক্ষাও অধিক আবশ্যক; কারণ, সত্যের নাগাল পাওয়া মনুষ্যের ভাগ্যে হয়-তো কোন কালেই ঘটিবে না, কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনা স্পষ্টই তাহার অধিকারায়ত্ত, এবং তাহা তাহার ক্ষমতার ভিতর। যেখানে দুইটি বিষয় অনুধাবন করিয়া ধরিবার কথা, সেখানে, যে-টি নিশ্চিত আমাদের আয়ত্ত-সুলভ সে-টিকে ছাড়িয়া—যে-টি অনিশ্চিত (হয় তো বা একেবারেই অপ্রাপ্য) সেটিতে হস্ত-প্রসারণ করা নিতান্তই যুক্তি-বিরুদ্ধ। এ ছাড়া, স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের যেমন একটি গুরুতর উদ্দেশ্য, এমন আর কিছুই নহে।

ঐ দুয়ের সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন মূল্য।

এইরূপ বিবেচনা বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের বিভিন্ন মূল্য বাঁধিয়া দেয়। তাহারই মূল্য সর্ব্বোচ্চ যাহাতে উপরি-উক্ত উভয় গুণ একাধারে বর্ত্তমান—অর্থাৎ যাহা সত্যও বটে—যুক্তিযুক্তও বটে। কিন্তু, যে তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র সত্য হইয়াও যুক্তিহীন, তাহা অপেক্ষা, যাহা সত্য না হইয়াও যুক্তিযুক্ত তাহার মূল্য অধিক।

যুক্তিহীন শাস্ত্রের কোন মূল্য নাই যেহেতু তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞা-বিরুদ্ধ।

যুক্তিহীন তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের কোন মূল্য নাই; কারণ যুক্তির পথ দিয়া সত্য প্রাপ্তির নামই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞাই ঐ। যে শাস্ত্র সত্যে উপনীত হয়—কিন্তু যুক্তির পথ দিয়া নহে, তাহা মূলেই তত্ত্বজ্ঞান নহে; তাহার কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। শুধু কেবল কথায় বিশ্বাস করিয়া কোন মনুষ্যই অপর মনুষ্যের নিকট হইতে সত্য গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। যুক্তিহীন সত্যের গ্রহণ, আর দোকানদারের কথায় বিশ্বাস করিয়া জিনিস্ কেনা, উভয়ই সমান। যে শাস্ত্র সত্য হইয়াও যুক্তিহীন তাহার সম্বন্ধে ভাল'র মধ্যে কেবল এই এক কথা বলা যাইতে পারে যে, যে শাস্ত্র দুয়ের বা'র (অর্থাৎ না সত্য—না যুক্তিযুক্ত) তাহা অপেক্ষা উহা ভাল।

যুক্তিহীন-শাস্ত্র সত্য হইলেও তাহার নিশ্চয়তা নাই।

আবার, যুক্তিহীন তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র যদি সত্যও হয়; তথাপি তাহা সত্যের কোন নিদর্শন স্বীয় গাত্রে ধারণ করে না। তাহা সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিশ্চিত নহে। কারণ, নিশ্চয়তা কিছু আর অমনি হয় না,—বলবৎ প্রমাণের উপর—শক্ত অকাট্য যুক্তির উপর—নিশ্চয়তা নির্ভর করে। অতএব যুক্তিহীন তত্ত্বজ্ঞানের সহিত নিশ্চয়তার কোন সংশ্রব নাই।

মনঃসংযমনের পক্ষেও ওরূপ শাস্ত্র কাজে লাগে না।

আরো এই,—বিজ্ঞান যে অংশে বুদ্ধি

পরিস্ফুটনের উপায়-স্বরূপ—সে অংশে বৈজ্ঞানিক সত্য-সকলের স্বতঃ কোন মূল্য নাই, "স্বতঃ" অর্থাৎ তাহাদের কোনটিকে অবশিষ্টগুলির মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহার কোন মূল্য নাই। বুদ্ধির বিকাশ যদি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হয়, তবে বৈজ্ঞানিক সত্য-সকলের মধ্যে যেরূপ সার্ব্বাঙ্গিক যোগ রহিয়াছে তাহারই অবধারণ এবং আলোচনা অভীষ্ট সাধনের পক্ষে সবিশেষ উপকারী। কিন্তু যুক্তিহীন তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র যতই কেন সত্য ও রীতি-সঙ্গত হউক না—তাহার বিভিন্ন অবয়ব-সমূহের মধ্যে এমন কোন মর্ম্মান্তিক বন্ধন নাই যাহাতে সকলেই সকলের সত্যাসত্যের ভাগী হইতে পারে। অতএব মনকে সুসংযত এবং সুশিক্ষিত করা যেখানে মুখ্য সংকল্প, সেখানে যুক্তি-হীন শাস্ত্র নিতান্তই নিষ্ফল।

যুক্তিযুক্ত শাস্ত্র নাও যদি সত্য হয়—বুদ্ধির পরিচালক বলিয়াও তাহার কতকটা মূল্য আছে।

আর এক দিকে দেখা যায়, যুক্তি-যুক্ত শাস্ত্র সত্য না হইলেও উহার কিছু না কিছু মূল্য আছে। উহা বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা জ্ঞান উৎপাদন করে। উহা সত্যে পৌঁছিতে না পারুক্—সত্য-প্রাপ্তির প্রকৃত পথ অনুসরণ করে। হইলে হইতে পারে উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সত্য নহে, কিন্তু তথাপি সেই এক-একটি অঙ্গ অভিপ্রেত চরম বিপাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবার এক-একটি ধাপ, অথবা যে-একটি নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খলার উপর চরম ফলের অভিব্যক্তি ভর করিয়া আছে, সেই শৃঙ্খলার এক-একটি কড়া। যদি কথিত শাস্ত্রের এক-একটি অবয়বকে শুদ্ধ কেবল ঐরূপ এক-একটি ধাপ কিম্বা কড়া বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যায় যে, উহা নিতান্ত নিষ্ফল নহে; কেননা, একদিকে উহা যেমন বুদ্ধিবৃত্তিকে বল-সাধক কার্য্য-বিশেষে ব্যাপৃত রাখে, আর-এক দিকে তেমনি নানা চক্রান্তের মধ্য হইতে অভিপ্রেত ফল উদ্ধার করিবার যে এক পরিতোষ, যাহা উপন্যাসে (এমন কি বিজ্ঞানেও) রস সঞ্চার করিতে ত্রুটি করে না, তাহাও তাহাকে প্রদান করে।

তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞার সহিত ইহার অধিকতর মিল আছে।

এরূপ শাস্ত্র (অর্থাৎ যাহা সত্য নহে কিন্তু যুক্তি-যুক্ত তাহা) পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট তত্ত্ব-জ্ঞানের সংজ্ঞা পর্য্যন্ত অত উচ্চে নাগাল না পা'ক—অন্যবিধ শাস্ত্র অপেক্ষা (অর্থাৎ যাহা সত্য কিন্তু যুক্তিহীন, তাহা অপেক্ষা) উহা উক্ত সংজ্ঞার অনেকটা কাছাকাছি যায়। কারণ, "সত্য লাভ করা হইতেছে কিন্তু যুক্তির পথ দিয়া নহে" এ-টি যেমন তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞা-বিরুদ্ধ কার্য্য, "সত্যে বঞ্চিত হওয়া হইতেছে কিন্তু যুক্তির পথ দিয়া" এটি তেমন নহে। যুক্তি-পথ ভিন্ন সত্য-প্রাপ্তির আরো নানা পথ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু যে শাস্ত্র তাহার কোনটিকে অবলম্বন করে, তাহা আর-যাহাই হউক্ না কেন—প্রকৃত পক্ষে তাহা তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র নহে।

সত্য এবং যুক্তিযুক্ত দুইই হওয়া চাই।

গোড়ায় যাহা বলিয়াছি—তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের দুইই হওয়া চাই; উহার যেখানকার যত প্রসঙ্গ সমস্তই সত্য হওয়া চাই; আর, ধারাবাহিক অকাট্য যুক্তি-পরম্পরা দ্বারা উহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রমাণীকৃত হওয়া চাই। এই দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রত্যেকেই যদিচ আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত, তথাপি উভয়ে একতানে মিলিত হইয়া গ্রন্থের আদ্যন্ত জুড়িয়া অকাট্য প্রমাণের একটা সুবিস্তীর্ণ সেতু প্রতিষ্ঠিত করিবে। এমন যদি কোন উচ্চ মূলের শাস্ত্র থাকে যাহা হইতে প্রভূত বৈজ্ঞানিক ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, তবে তাহা এইরূপ শাস্ত্র।

তত্ত্বজ্ঞানের গ্রন্থাবলী অধীত হইতে পারে, বাক্যাবলী শ্রুত হইতে পারে, কিন্তু তাহার একটি অকাট্য যুক্তিযুক্ত শাস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই শেখা কিম্বা শেখানো যাইতে পারে না।

এ পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় নাই।

তত্ত্ববিদ্‌গণের বিরচিত শাস্ত্র-সমূহের সত্যাসত্য বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া, এ কথা আমরা অকুতোভয়ে বলিতে পারি যে, উহাদের কোনটিই যুক্তিযুক্ত নহে; যুক্তিযুক্ত বলিতে আমরা এইরূপ বুঝি যে, তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট অকাট্য প্রমাণের একটি নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খলা প্রসারিত থাকিবে—তবেই বলিব যে, তাহা যুক্তিযুক্ত। পূর্ব্বপূর্ব্ব তত্ত্ব-পন্থীরা তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বোক্ত দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের একটির সাধনে যতই কেন তৎপর হউন্ না, কিন্তু দুয়ের মধ্যে যেটি বেশী মর্ম্মান্তিক ও নিতান্ত না হইলেই নয়, সেইটিকেই তাঁহারা অবহেলা করিয়াছেন। আর, ইহার ফল সমস্ত পৃথিবীময় গভীর অসন্তোষের অস্ফুট ধ্বনি-রূপে গুমরিয়া গুমরিয়া জানান্ দিতেছে। নিম্ন পরিচ্ছেদের কথাগুলি ঐ অস্ফুট-ধ্বনির মর্ম্ম-নিহিত ভাবটি সম্যক্‌রূপে না হউক—যথার্থরূপে ব্যক্ত করিতেছে।

তত্ত্বজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থা।

সকলেই এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদ যথেষ্ট আছে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান নাই। ঠিক্ কথা। তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কত লোকে কতই লিখিতেছে—উপর্য্যুপরি লিখিতেছে। কিন্তু আসল বস্তুটিকে কেহই আজ পর্য্যন্ত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিতে পারিল না। পৃথিবীর যাবতীয় তত্ত্ব-জ্ঞানের পুঁথি-পাঁজি দেখিলে বোধ হয়—যেন মূল-গ্রন্থ বহুকাল-যাবৎ বিলুপ্ত হইয়াছে (কোন কালেই ছিল না বলিলে আরো ঠিক্ হয়), কেবল তাহার টীকা ও ভাষ্যের বোঝা রাশীকৃত পড়িয়া আছে,—প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র কোথাও নাই। মল্লিনাথকে কালিদাস বলা—শঙ্করাচার্য্যকে বেদব্যাস বলা—আর,এখনকার তত্ত্বজ্ঞানের গ্রন্থাবলীকে তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্র বলা অবিকল একই কথা। এ সকল গ্রন্থ কেবল আংশিক এবং অসম্বদ্ধ টিপ্‌পনী-রাশি,—দুর্ভাগ্য বশতঃ মূল গ্রন্থে কেহ যে হস্তার্পণ করিবেন তা'র জো নাই—কেননা তাহা কোন স্থানেই নাই। এই জন্যই দার্শনিক মহলে এত গোলোযোগ; যিনিই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ পূর্ব্বক মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারই তাহাতে অসন্তোষ এবং অনাস্থা জন্মিয়াছে। এমন কোন বিচারাসনের নাম-গন্ধও নাই যেখানে কোন বিবাদস্থল মীমাংসার্থে সমর্পিত হইতে পারে। এমন একটিও গ্রন্থ নাই যেখানে ঠিকঠাক নিরপেক্ষ-ভাবে দার্শনিক সমস্ত মতের সংহিতা বিন্যস্ত রহিয়াছে ও যেখানে দার্শনিক তর্কবিতর্কের মূল-সূত্র গুলির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এই জন্য তত্ত্বজ্ঞান শুধু যে কেবল একটা সংগ্রাম তাহা নহে কিন্তু এইরূপ এক অদ্ভুত সংগ্রাম যাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি,কোন যোদ্ধাই—স্বপক্ষেরই বা কি আর বিপক্ষেরই বা কি—কোন পক্ষেরই বিবাদের ভিত্তি-মূল অবগত নহে; এমন কি, যাহা লইয়া বিবাদ চলিতেছে তাহার কোন্ দিক্‌টাই বা আক্রমণ করা হইতেছে, কোন্ দিকটাই বা বাঁচানো হইতেছে, তাহাও কাহারো দেখা-শুনা নাই। এই যে পুৎলা-বাজির যুদ্ধ ইহার কল এত গভীরে পাতা আছে যে, সেখানে যোদ্ধাগণের দৃষ্টি চলে না। যে কোন মত গ্রাহ্য করা হয় তাহাও অন্ধভাবে করা হয়, আর যে কোন মত অগ্রাহ্য করা হয় তাহাও অন্ধ-

ভাবে করা হয়, কিগুণে যে গ্রাহ্য করা হইল—আর কি দোষে যে অগ্রাহ্য করা হইল তাহা কাহারো তলাইয়া দেখা নাই। যখনই অস্ত্রাঘাত প্রয়োগ করা হয়—তা সে সত্যের পক্ষেই হউক্ আর ভ্রান্তির পক্ষেই হউক্—তাহা জ্ঞান-শূন্য এলোধ্যাবড়া রকমে প্রয়োগ করা হয়।

প্রথম, এরূপ হয় কেন? দ্বিতীয়, ইহার প্রতীকার হয় কিসে?

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহাতে কিছুই বাড়াইয়া বলা হয় নাই বরং অনেক কমাইয়া বলা হইয়াছে। স্বয়ং যাঁহারা তত্ত্ববিৎ তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিই—কিন্তু যাঁহারা সত্যের ঐসব দুরারাধ্য দ্বার-রক্ষকদিগের মর্ম্ম-কথার ভিতর কিঞ্চিন্মাত্র দন্তস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের ঐ কথায় সহজেই প্রত্যয় যাইবেন। ইহা যখন দেখা কথা যে, তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থা উহা অপেক্ষা মন্দ বই ভাল নহে—তখন ইহাই জিজ্ঞাস্য যে, প্রথমতঃ ঐরূপ বিশৃঙ্খলা কি কারণে ঘটিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ কিরূপে উহার প্রতীকার হইতে পারে।

প্রথম,—সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বকথিত প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়টির অবহেলাই উহার মূল,—তত্ত্বজ্ঞান যুক্তি-দ্বারা সমর্থিত হয় না বলিয়াই ঐটি ঘটিয়াছে। যুক্তি-দ্বারা সমর্থন করা কাহাকে বলে তাহা কাজে না দেখাইয়া, শুধু কেবল কথায় বলিয়া, বুঝানো যাইতে পারে না। কেহ যদি কার্য্যতঃ এবং বিস্তারতঃ ইহার দৃষ্টান্ত-প্রয়োগ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে আমরা এই গ্রন্থের মুখ্য অবয়বটির প্রতি মনোনিবেশ করিতে বলি। এ বিষয়ের কোন সাধারণ মন্তব্য পাঠককে হয় তো এমন কোন কিছুই শিখাইতে পারিবে না যাহা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জানা নাই; তাহা তাঁহার সম্মুখের পথে আলোক প্রদান না করিয়া বরং অনেক ক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে আশ-পাশের গলি-ঘুঁচির মধ্যে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে। আর আর কার্য্যের ন্যায় যুক্তিও—করিয়া যেমন বুঝানো যায়—বলিয়া তেমন বুঝানো যায় না। তত্ত্বজ্ঞানের অসন্তোষ-জনক অবস্থার কারণ তবে এইটিই স্থির যে, তাহা যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয় না।

যতক্ষণ না তত্ত্বজ্ঞান যুক্তিযুক্ত হইবে ততক্ষণ তাহা হইতে কোন সুফলের প্রত্যাশা করা বৃথা।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞানকে গোড়া হইতে শক্তরূপে প্রমাণ করিয়া তোলা হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে তাহার আর নিষ্কৃতি নাই; ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে কলহের বিরাম-প্রত্যাশা দূরে থাকুক্—একজন এক কথা বলিতেছেন আর-একজন আর-এক কথা বুঝিতেছেন—এইরূপ বিপরীত অর্থ-বোধই ক্রমাগত চলিতে থাকিবে। সব নাবিক ভিন্ন ভিন্ন আদেশ অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন পথে, ভিন্ন ভিন্ন বায়ুর বলে, পা'ল-ভরে চলিয়াছে; আর, প্রতিজনেই আর-সকলের সহিত এই বলিয়া কলহ করিতেছে "কেন তোমরা আমার সহিত এক পথে না যাও।" ইহা অপেক্ষা আরো উত্তম রহস্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞানের এমন কোন দ্বন্দ্ব-ক্রীড়া নাই যাহাতে উভয় পক্ষ একই খেলায় প্রবৃত্ত; দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে জয় পরাজয়ের খুবই ধূম-ধাম চলিতেছে, অথচ উভয়ের মধ্যে একজন খেলিতেছেন সতরঞ্চ—আর এক জন খেলিতেছেন পাশা,—এ জয়ই বা কিরূপ, আর এ পরাজয়ই বা কিরূপ, তাহা বুঝা-ই যাইতেছে। এইরূপ সৃষ্টি-ছাড়া সংগ্রামের মূল কারণ আর কিছুই নহে—তত্ত্বজ্ঞানকে গোড়া হইতে যুক্তি-দ্বারা প্রমাণ করিয়া তোলা হয় নাই, তাই বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে এমন কোন সাধারণ বিবাদ-স্থল

খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা লইয়া উভয়ের মধ্যে বোঝা-পড়া চলিতে পারে।

তত্ত্বজ্ঞানের মুখ-কোষ অর্থাৎ মুকোষ।

সময় যত অগ্রসর হইয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানের দশা তত ভাল'র দিকে না যাইয়া মন্দের দিকেই অবনত হইয়াছে। ইহা তো হইবেই; গোড়ায় মূলতত্ত্ব-সকলের রীতিমত অবধারণ নাই—কঠোর যুক্তি দ্বারা আট ঘাট বন্ধন করা নাই—অথচ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে আগে আগে তাড়াইয়া লইয়া চলা হইতেছে, এরূপ করিলে সত্যের গাত্রে বস্ত্র যাহা জড়ানো আছে তাহা তো আছেই, তাহার উপর আরো বস্ত্রের পর বস্ত্র জড়াইয়া দেওয়া হয়। তত্ত্বজ্ঞানের প্রত্যেক জিজ্ঞাস্যই আর এক জিজ্ঞাস্যের আবরণ। চরম (আসল ধরিতে গেলে আদিম) জিজ্ঞাস্যটিতে উপনীত হইতে হইলে ঐ সমস্ত আবৃত-আবরক জিজ্ঞাস্য গুলিকে সরাইয়া ফেলা আবশ্যক। বহিরাবরণটি সর্ব্বাগ্রে আমাদের সম্মুখে দেখা দেয় বটে, কিন্তু তাহাকে এবং তাহার নীচের নীচের সমস্ত আবরণ গুলিকে যে পর্য্যন্ত না আমরা সরাইয়া ফেলিতে পারি, সে পর্য্যন্ত আমরা তাহাদের কাহারো প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে পারি না। এক জিজ্ঞাসুর পর আর এক জিজ্ঞাসু যিনিই আসেন—তিনি কেবল সর্ব্বোপরিস্থ আবরণটি একটানে সরাইয়া ফেলিয়াই ক্ষান্ত হ'ন,—সমস্ত আবরণগুলিকে যে একে একে সরাইয়া ফেলা আবশ্যক, সে দিকে কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই; ইহার ফল এই হয় যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রথম আবরণটির জটিলতা মোচন করা দূরে থাকুক—তাহার গাত্রে এক পোঁচ রঙ্ মাখাইয়া দে'ন, নৈসর্গিক আবরণের উপর স্বদত্ত একটি আবরণ চাপাইয়া রাখেন,—ইহাতে সত্যের পথ পূর্ব্বাপেক্ষা আরো জটিল হইয়া উঠে। এই কারণে, এখন, এমন কোন প্রশ্নই লোকের সম্মুখে উপস্থিত হয় না যাহা নৈসর্গিক এবং কৃত্রিম নানা ছদ্মবেশে স্তরে স্তরে আবৃত নহে; আর, এই সব মুকোষের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়িতেছে; লোকে সত্য সত্যই মনে করে যে, জড় বস্তু আছে কি না—এও একটা তত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাসা বিষয়, অথবা কোন কালে জিজ্ঞাসা বিষয় ছিল। জিজ্ঞাস্যটি আর কিছুই নয়—রাশি-রাশি মুকোষের একটা অবগুণ্ঠন মাত্র। সব গুলিকে না সরাইলে প্রকৃত প্রস্তাবের মুখ-দর্শন পাওয়া দুর্ঘট। আর একটি আবছায়া—যাহাকে তত্ত্বজ্ঞানীরা "সম্বন্ধাতীত" এই নাম প্রদান করিয়া সুখী হ'ন—তাহাও একটি মুকোষ (এমন কি মুকোষের সমস্ত দোকান-কে-দোকান বলিলেও হয়); কিন্তু ঐ শব্দটির অর্থ তাঁহারা ঠিক্ ঠাক্ কি যে বোঝেন—রাশি রাশি সাজ-সজ্জার নিপীড়নের ভিতর বস্তুটা যে কি—এ বার্ত্তাটি কেহই লাঘব স্বীকার করিয়া আমাদিগকে বলেন না; যাঁহারা ঐ মুকোষমুখো অজ্ঞাত-বাসীটিকে তাড়াইয়া গিয়া ভূ-পাতিত করেন, তাঁহারাও তাহা বলেন না আর, যাঁহারা ভাল কথায় উহার সহিত আলাপ করেন, তাঁহারাও তাহা বলেন না। ফলে, একথা সুনিশ্চিত যে, এই দুই-সহস্র বৎসর ধরিয়া কোন মনুষ্য একটিও দার্শনিক জিজ্ঞাস্যের রক্ত-মাংসের সজীব মূর্ত্তি আজ পর্য্যন্ত দেখেন নাই।

দর্শনের ভূমণ্ডল।

এরূপ যে, কেন হয়, তাহার মীমাংসা এই;—লোকে ভাবে যে, সম্মুখে পদার্পণ করিলেই তত্ত্বজ্ঞান-পথে অগ্রসর হওয়া যায়; কিন্তু বাস্তবিক এই যে, সে পথে অগ্রসর হইতে হইলে পিছাইয়া চলা আবশ্যক। আগে আমরা মূলে না যাইয়া, অন্তে পৌঁছিবার জনাই প্রয়াস পাইয়াছি। তত্ত্বজ্ঞানীরা মূলতত্ত্ব-সকল করায়ত্ত না করিয়াই সিদ্ধান্তের

মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার প্রকৃত বিবরণ এই;—দার্শনিক জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় মণ্ডলাকৃতি,—কিন্তু সমুদায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জড়ো হইলেও তাহার ন্যায় অত বড় একটা বিপুলায়তন দুষ্পরিক্রম্য মণ্ডল হইয়া উঠে না। সমুদায় চিন্তার বীজ-ধাতু, সমুদায় যুক্তির মূলতত্ত্ব, সমুদায় জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী মূল উপাদান, সত্যের সমস্ত চাবি, প্রথমে আমাদের পায়ের নীচেই মাটি-চাপা থাকে; কিন্তু তখন তাহার আবিষ্কারে আমাদের অধিকার নাই। অগ্রে আমাদিগকে সমস্ত মণ্ডলটি পরিভ্রমণ করিতে হইবে,—দর্শনের সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিশ্রান্ত-পদে পর্য্যটন করিতে হইবে। এই জন্য আমাদের প্রত্যেক পদ-ক্ষেপই আমাদিগকে লক্ষ্য স্থান হইতে দূরে দূরে লইয়া যায়। কিছুকাল পরেই সত্যের বীজ ধাতু সকল—যাহা আমরা অস্ফুট আলোকে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি—তাহা বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, অথচ আমরা মনে করি যে তাহা সম্মুখস্থিত দিক্-চক্রবালে বুঝি-বা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। পরিত্যক্ত গৃহ-দেবতার ন্যায় তাহাকে আমরা অনেক দূর ছাড়িয়া আসিয়াছি, অথচ তাহা আমরা জানি না। তবুও আমরা সম্মুখে ভর করিয়া এমন একটা পথে চলিতে থাকি—যাহা ঠিক্ পথও বটে—না-ও বটে; ঠিক্ পথ নয়, কেন না প্রত্যেক পদ ক্ষেপেই আমরা সত্য হইতে দূরে পড়ি; ঠিক্ পথ, কারণ তাহা ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। যাইতে যাইতে যখন যেখানে আমাদের পা থামে, সেই স্থানই আমাদের আতঙ্ক ধাঁদা ও ভয় বাড়াইয়া দেয়। অকূল দর্শন-সাগরের মধ্য-পথ পার হইতে না হইতে আমাদের মন একেবারেই দমিয়া যাইতে পারে। মণ্ডলের উপরি ভাগ হইতে অধোভাগে উত্তীর্ণ হইলে সংশয়ের ঘন-ঘটা আমাদের পথে অন্ধকার করিয়া বসিতে পারে, এবং নিরাশার ঝটিকা আমাদের স্থৈর্য্যকে বিকম্পিত করিতে পারে। এখন যে আমরা পিছু হটিব তাহারও জো নাই। এখন আমরা অপরিহার্য্য ব্রত উদ্‌যাপনে প্রবৃত্ত। এখন সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তির মধ্য দিয়া ভিড় ঠেলিয়া চলা ভিন্ন আর উপায় নাই। ভৌতিক জগতের ন্যায় বৈজ্ঞানিক জগৎ একটা গোল পদার্থ; যে সময়ে পরিব্রাজক মনে করিতেছেন যে, তিনি মনুষ্যের অধিকার ছাড়াইয়া দূরত্বের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছেন, তাহার পরক্ষণেই তিনি দেখেন যে, তিনি আপন গৃহে বিরাজমান। তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার তাঁহার সেই জন্ম স্থানে আসিয়াছেন। আবার তিনি তাঁহার চির-পরিচিত পুরাতন গার্হস্থ্য দ্রব্য-সামগ্রীতে পরিবৃত। কিন্তু এখন চির-পরিচয়ের অবজ্ঞা অন্তর্দৃষ্টির অভিজ্ঞতায় পরিণত হইয়াছে; তত্ত্বজ্ঞানের পরিশ্রম তাঁহাকে সবল করিয়াছে; এবং তত্ত্ব-চিন্তার ফল তাঁহাকে বিজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে। এখন তিনি ভূমি খনন করিয়া সত্যের চাবি উদ্ধার করিবার অধিকারী; এখন তিনি জ্ঞানের বীজ-ধাতু-সকল দেখিতে এবং দেখাইতে সমর্থ। এখন তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে নূতন এক জ্ঞান-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত দেখেন। প্রথম তিনি যে জ্যোতিতে দেখিতেন—এ জ্যোতি তাহা অপেক্ষা বহু-পরিমাণে বিশুদ্ধ এবং অক্ষুণ্ণ। এইখানেই তত্ত্বজ্ঞানে এবং সহজ জ্ঞানে কোলাকুলি হয়।

সকলের গোড়ার তত্ত্ব-গুলি সকলের শেষে বাহির হয়।

তত্ত্বজ্ঞানের যুক্তিহীন এবং সাধারণতঃ অসন্তোষ-জনক অবস্থার কারণ এই যে, কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি মূলে পৌঁছান নাই; ইহারও কারণ দর্শানো যাইতে পারে—যদিচ সে কারণের জন্য কোন মনুষ্যই

দায়ী নহে কেন না তাহা প্রকৃতির একটি অবশ্যম্ভাবী নিয়ম; সে কারণ এই যে, প্রকৃতির গণনাতে যাহা প্রথম, জ্ঞানের গণনাতে তাহা চরম। এইরূপ বিবেচনা একদিকে যেমন মনুষ্যকে অপরাধের দায় হইতে অব্যাহতি দেয়, আর-এক দিকে তেমনি—"আজ পর্য্যন্ত কেন তত্ত্বজ্ঞানের বর্ণ-পরিচয়ও সাঙ্গ হইল না,—কেনই বা যুক্তিহীন তত্ত্ব-শাস্ত্রের এত সংখ্যা-বাহুল্য—অথচ তত্ত্ব-জ্ঞানের ক-খ শিক্ষা এখনো বাকি পড়িয়া আছে" ইহার কারণ স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করে। উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টির মর্ম্ম আরো অধিক পরিস্ফুট হইবে।

ভাষা এবং ব্যাকরণের উদাহরণ।

যত প্রকার মূলতত্ত্ব আছে সমস্তই জ্ঞানে উদ্ভাসিত এবং স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইবার বহু-পূর্ব্বে লোকসমাজে আপনাদের প্রভাব সমর্থন করে ও বিস্তীর্ণরূপে এবং বলবৎরূপে কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। ভাষা ইহার একটি প্রধান উপমাস্থল। ব্যাকরণের মূলতত্ত্ব-গুলি ভাষার মূলে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার সংগঠনের উপর কর্ত্তৃত্ব করে; কিন্তু ইহারা-সকলে অন্ধকারেই স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে। ইহাদের কর্ত্তৃত্ব-বশে ভাষা যখন আকার-পরিগ্রহ করিতেছে, তখন কোন মনুষ্যেরই বুদ্ধি উঁহাদের গুপ্ত কার্য্যের অন্ধি-সন্ধি খুঁজিয়া পায় না। তথাপি যিনিই যথাযোগ্য-রূপে ভাষা ব্যবহার করেন, তিনিই ঐ সকল মূলতত্ত্বে সম্ভৃত—অথচ তিনি উঁহাদের অস্তিত্বের বিন্দু-বিসর্গও উপলব্ধি করেন না। উঁহাদের উপস্থিতি এবং অস্তিত্ব জ্ঞান-গম্য হইবার বহু-পূর্ব্বে উঁহাদের কার্য্য এবং প্রভাব অনুভূত হয়। ভাষার উৎপত্তি-সাধিকা ক্রিয়া-গুলি গুপ্ত; উহার অবয়ব-বৃদ্ধির ক্রম প্রত্যক্ষের অগোচর। নির্জ্জন গহন প্রদেশ-স্থিত সহস্র বৎসরের বৃক্ষের ন্যায় অলক্ষিত ভাবে জন্মকালো এক ভাষার বিপুল কাণ্ড গাত্রোত্থান করিয়া উঠে, তেমনি তাহার শাখা-প্রশাখা। আগে কেহই বীজ নিক্ষিপ্ত হইতে দেখে নাই—অভিনব অঙ্কুরোদ্গম কাহারো চক্ষে পড়ে নাই—কাহারো হস্ত আরণ্যক শিশুটির মূলে জল-সিঞ্চন করে নাই, ক্রম-বিবর্দ্ধিত দেহ-পুষ্টি ও ছায়া-বিস্তারের কোথাও কোন লিখিত নিদর্শন রক্ষিত হয় নাই—আগে এসব কিছুই হয় নাই, কিন্তু তাহার পর যখন চারিদিকের অপভাষা-গুলি মরিয়া নিঃশেষিত হইল, অকস্মাৎ যখন ভাষাটির পূর্ণ অবয়ব আবরণ-মুক্ত হইয়া স্বীয় মহিমায় সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল, তাহার পল্লবে পল্লবে যখন শূর-বীর পুরুষগণের কবিতা, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, সভ্য জগতে যখন সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য এবং দর্শনের ফল অবিরত নিপতিত হইতে লাগিল—তখন তাহার মূলের খোঁজ পড়িল।

বেলা অনেকটা অতিবাহিত হইয়া গেলে তবে ভাষার বীজতত্ত্ব-গুলির সন্ধান মেলে ও তাহাদের ব্যাখ্যা বিবৃত হয়। এই সকল বীজ-তত্ত্বেরই প্রসাদাৎ ভাষার উৎপত্তি এবং উন্নতি, ইহারাই ভাষা-সংগঠনের মূল-নিয়ামক; অথচ এরূপ ঘটনা কিছুই বিচিত্র নহে যে, ঐ সব মূল-তত্ত্ব আলোকে উদ্ভাসিত ও ব্যাকরণে লিপিবদ্ধ হইবার বহু-পূর্ব্বে ভাষার লৌকিক ব্যবহার লুপ্তাবশিষ্টে পরিণত হইয়াছে। এমন যে আদিম শিক্ষা ক-খ-গ, ইহাও ভাষার উৎপত্তি এবং প্রচারের সহস্রাধিক বৎসর পরে তবে লোকের মনে ও রসনায় স্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে; অথচ ঐ অক্ষর-গুলি, বাক্যের ঐ সার-ভূত বীজ-গুলি, ভাষার উৎপত্তির গোড়াতেই ছিল।

ন্যায়-শাস্ত্রের উদাহরণ।

ন্যায়-শাস্ত্র আর-একটি দৃষ্টান্ত। মনুষ্য

যখন ন্যায়-শাস্ত্রের কোন নিয়মই অবগত নহে—যুক্তি-প্রকরণ কাহাকে বলে তাহাও জানে না—সে তাহার বহু-পূর্ব্ব-হইতে পুরুষানুক্রমে যুক্তি খাটাইয়া আসিয়াছে। আদি কাল হইতে প্রত্যেক যুক্তি-ব্যাপারেই ন্যায়ের মূলতত্ত্ব-সকল কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, অথচ গৌতম যে-পর্য্যন্ত না যুক্তির অবয়ব-গুলি তন্ন তন্ন করিয়া প্রদর্শন করিলেন এবং সহজ ও সামান্য চিন্তা-কার্য্যের নিয়মাবলী বিবৃত করিলেন, সে পর্য্যন্ত যুক্তিকারী তাহার প্রভাব তিলমাত্রও উপলব্ধি করে নাই।

রাজ-নিয়মের উদাহরণ।

রাজ-নিয়মের সংগঠন-ব্যাপারেও ঐ উপমাটি অনেক অংশে সংলগ্ন হয়। সমাজের স্থিতি-বন্ধনের মূলীভূত রাজ-নিয়ম-সকল লিপিবদ্ধ হইবার বহু পূর্ব্বে, প্রাচীন জন-শ্রুতি-মূলক সংস্কারের বলে ভিতরে ভিতরে উহার কার্য্য চলিতে থাকে। লিখিত স্মৃতি-শাস্ত্র কিছু আর রাজ-নিয়ম সৃষ্টি করে না,—তবে কি? না যে-সব মূলতত্ত্ব পূর্ব্বে আল্‌গা-রকমে লৌকিক ব্যবহার নিয়মিত করিত—লিখিত শাস্ত্র সেই নিয়ম গুলিতে স্পষ্ট প্রচার-যোগ্যতা এবং শাস্তৃত্ব প্রদান করে। সংক্ষেপে, রাজ-নিয়ম সংস্থাপিত বা জ্ঞাত হইবার বহু-পূর্ব্বে উহা লোক-সমাজে বিদ্যমানও থাকে—লোক-সমাজকে বন্ধনও করে। উহা সুস্পষ্ট এবং পরিপাটী শৃঙ্খলাবিশিষ্ট অবয়ব ধারণের পূর্ব্বে অব্যক্ত এবং প্রচ্ছন্ন ভাবে কার্য্য করে। প্রকৃতির পংক্তিতে উহারা সকলের আগে আইসে, জ্ঞানের পংক্তিতে উহারা সকলের শেষে আইসে; কার্য্যের সময় সকলের আগে আসিয়া উপস্থিত হয়, জ্ঞানে আয়ত্ত হইবার সময় সকলের শেষে দেখা দেয়।

তত্ত্বজ্ঞানেরও ঐরূপ।

তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধেও ঐরূপ। তত্ত্বজ্ঞানের মূল-তত্ত্ব গুলি—সমস্ত বিজ্ঞান এবং শিল্পের বীজ-ধাতুর ন্যায়—প্রকৃতির ব্যবস্থায় যদিচ সর্ব্ব-প্রথম কিন্তু জ্ঞানের ব্যবস্থায় উহারা সকলের চরম। তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির মধ্যে প্রভেদ কেবল এই যে, তত্ত্বজ্ঞানের মূলতত্ত্ব-সকল যেমন কালের সর্ব্ব-প্রথম সন্তান—তেমনি উহারা সকলের শেষে রাশি-রাশি মৃত্তিকা-স্তূপের মধ্য হইতে উদ্ধৃত হয়। উহারা মনুষ্যের সাধারণ বৃত্তি-সমূহকে আলোকের দিকে বলপূর্ব্বক প্রক্ষিপ্ত করে, অথচ আপনারা পশ্চাতে সঙ্কুচিত হইয়া আড়ালে থাকে। এই যে একটি নিয়ম যে, অস্তিত্বে যাহা সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী—অভিব্যক্তিতে তাহা সকলের পশ্চাৎবর্ত্তী—কুত্রাপি এ নিয়মের ব্যভিচার নাই। তাই আমরা বলি যে, বিজ্ঞান পশ্চাতে চলিয়াই, অথবা যাহা আরো ঠিক্‌—ঘুরিয়া ফিরিয়া স্বস্থানে আসিয়াই, অগ্রসর হইতে পারে; অনন্ত ভবিষ্যৎ কালই অনাদি অতীত কালের রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারে। আর, মনুষ্য-জ্ঞানের চরম অভ্যুদয় এবং জয়-লাভ তখনই সুনিষ্পন্ন হয়, যখন সে—সমস্ত চিন্তা-চক্র পরিভ্রমণ করিয়া, গভীর-তর অন্তর্দৃষ্টিতে এবং স্বচ্ছ চেতনে সমৃদ্ধ হইয়া, স্বস্থানে ফিরিয়া আসে,—আসে কেবল তাহার আদিম জন্মস্থানের অপার্থিক মহিমায় নিমগ্ন হইতে।

ক্রমশঃ।

চরিত্র।

ধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ ধারণা। মনোবৃত্তির দুই প্রকার অবস্থা অন্তর্ম্মুখ ও বহির্ম্মুখ। প্রথমটী ধর্ম্মসাধনের অনুকূল, দ্বিতীয়টী প্রতিকূল। মনের যে বহির্ম্মুখ ভাব, অর্থাৎ বিষ-

যের প্রতি তাহার যে স্বৈর গতি, ধর্ম্ম তাহা ধারণ বা রোধ করে। ইহাই ধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ। কিন্তু অনেকে মনের এই স্বৈর গতি নিরোধ করিবার নিমিত্ত শরীরশোষণের ব্যবস্থা করেন। যদি ইহা বল যে শরীর দুর্ব্বল হইলে মনও অনেকটা নিস্তেজ হয় এবং সে অবস্থায় তাহাকে যে দিকে ইচ্ছা নিয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু বাস্তব ইহা দ্বারা ধর্ম্ম-বলের একটী ঘোর অবমাননা করা হয়। ধর্ম্ম স্বয়ং এই কার্য্যে অসমর্থ বলিয়া যেন একটা বাহ্য শক্তির আবশ্যকতা স্বীকার করা হয়। আর যদিও স্বীকার কর শরীরশোষণ ধর্ম্মের একটী অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, ইহাও ঠিক নয়। কারণ ধর্ম্মের প্রভাব মনে যে গতি আনে মনের পক্ষে ইহা তো শিক্ষা অর্থাৎ অন্তঃসংস্কার, ইহা কিছুতেই যাইবার নয়। কিন্তু শরীরশোষণ প্রভৃতি উপায় মনে যে গতি আনে তাহা বাহ্য ব্যাপার মাত্র। ইহা শিক্ষাও নয়, সংস্কারও নয়। সুতরাং কারণের অভাবে কালে এই কার্য্যের নাশও আছে। সুতরাং যদিও আশু ইহা দ্বারা কোন ফল হয় কিন্তু তাহার স্থায়িতা নাই। পুরাণ পাঠে দেখা যায় কোন ঋষি দীর্ঘ কাল অনশনে শরীর শোষণ পূর্ব্বক গ্রীষ্মের উত্তাপ, বর্ষার বৃষ্টি ও দুরন্ত শীত সহ্য করিয়া মনোনিগ্রহে যত্ন করিতেছেন কিন্তু স্ত্রীসৌন্দর্য্য এক নিমেষে তাঁহার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল। ফলত মনোনিগ্রহের ইহা যে প্রকৃত পথ নয় প্রাচীন কবিরা ইঙ্গিতে তাহাই বলিয়াছেন। আরও একটী কথা এই, তাহাই প্রকৃত শক্তি যাহা সহস্র সহস্র বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে প্রসর পাইতে পারে। এই জন্য ভগবান বুদ্ধ মনোবৃত্তি নিরোধের পক্ষে অনশনকে পর্য্যাপ্ত মনে করেন নাই। তিনি ইহা দ্বারা অবশ্য শিষ্যগণের বিরাগভাজন হন কিন্তু তাঁহার স্থির বিশ্বাস মন নিরোধের পক্ষে ধর্ম্মবলই পর্য্যাপ্ত। আর মনুও বলিয়াছেন শরীরশোষণ মনের শিক্ষার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় নয়। অতএব ধর্ম্মই আমাদের মনোবৃত্তির বিক্ষেপ ভাব দূর করিবার এবং তাহাকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া বিষয়াতীতের প্রতি লইয়া যাইবার পক্ষে যথেষ্ট। ধর্ম্মের এই প্রথম লক্ষণ।

দ্বিতীয় লক্ষণ প্রেরণা। অর্থাৎ কর্ত্তব্যার্থে নিয়োগ। মনুষ্যের কি সঙ্কট অবস্থা। তাহার অতীতের কোনও পদাঙ্ক নাই, ভবিষ্যৎ নাতিপরিস্ফুট আলোকে দৃশ্যমান একটা গভীর অন্ধকার। আর তাহার বর্ত্তমানে এই বিস্তীর্ণ সংসার। সংসার যে কি প্রহেলিকা কিছুই বুঝিবার যো নাই। ইহাতে কেবলই বিচিত্রতা। প্রীতি ও বিচ্ছেদ, পাপ ও পুণ্য, হর্ষ ও বিষাদ, স্বাস্থ্য ও রোগ এইরূপ নানারূপ বিরোধি ভাব ইহাতে পর্য্যায়ক্রমে আসিতেছে ও যাইতেছে। মনুষ্য নানা প্রকার জটিল কার্য্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ। মনুষ্য-সমাজেরও আপাদ মস্তক পরস্পরের বিরোধি স্বার্থে জড়িত। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের প্রেরণা-শক্তি তাহাকে রক্ষা করিতেছে। আমরা ধর্ম্মের উদার বক্ষে সকল স্বার্থকে সমবেত দেখি এবং তাঁহার প্রেরণা অনুসারে চলিয়া থাকি। ইহাতে স্বার্থের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ভঞ্জন হয় এবং সংসারের স্থিতিও অব্যাহত থাকে। ইহাই ধর্ম্মের প্রেরণা।

এখন ধর্ম্মকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দুইটী ভাব পাইলাম। প্রথম ধারণা দ্বিতীয় প্রেরণা। ধারণা-গুণে মনুষ্য মনের প্রভু হয় এবং প্রেরণা-গুণে সে কর্ত্তব্যে উদ্বোধিত হইয়া থাকে। আবার ধর্ম্মের এই দুই উপাদান মনুষ্যের চরিত্রের প্রতি কারণ হইতেছে। চরিত্র বলিতে কার্য্য বুঝায়। সুতরাং চরি-

ত্রের ভিতরও দুইটী শক্তি অলক্ষিত ভাবে রহিয়াছে। প্রথম,বুদ্ধির বহুশাখা হইতে এক-তর কোটিতে অধ্যবসায়। যদি তোমার বুদ্ধি বহু বিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকে তবে সেইরূপ অস্থিরতার অবস্থায় তোমার কার্য্যপ্রবৃত্তি হইবে না। একতর কোটিতে—কোন উদ্দেশ্যে তোমার স্থির হওয়া চাই। ফলত ইহা ধর্ম্মের ধারণাগুণে হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বিচারপূর্ব্বক কার্য্য। অর্থাৎ অকার্য্য হইতে কার্য্যকে পৃথক করিয়া তাহার অনুষ্ঠান। ইহা ধর্ম্মের প্রেরণাগুণে হইয়া থাকে। এক্ষণে কথা এই, সকলে চরিত্রবান হয় না কেন। ইহার এক উত্তর স্বার্থপরতা। স্বার্থপরতায় আশুতৃপ্তি আছে। কিন্তু চরিত্রবত্তায় অনেক ত্যাগস্বীকার চাই। আবার এই ত্যাগস্বীকার যে কিরূপ কঠিন তাহা বুঝাইতে হইলে মনুষ্যপ্রকৃতির বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। জগতে দুই প্রকার ভাব আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি কঠোর আর কতকগুলি কোমল। যেগুলি আশুতৃপ্তিকর প্রবৃত্তির বিরোধী তাহা কঠোর। ইহাকে আমরা নীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। আর যে গুলি আশুতৃপ্তিকর প্রবৃত্তির অনুকূল তাহা কোমল। ইহাকে ভোগ নামে নির্দ্দেশ করিলাম। মনুষ্যপ্রকৃতি এই দুই ভাবের ক্রীড়নক হইয়া আছে। কিন্তু যে প্রকৃতি আমূলত কঠোরতার লৌহময় ক্রোড়ে লালিত হয় সে কোমলতার অভাব সহিতে পারে। আর যে প্রকৃতি আমূলত কোমলতার পল্লবাস্তরণে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করে তাহার পক্ষে কঠোরতা সহ্য হয় না। জগতে এই ভাবই বলবৎ। তবে কখন কখন যে ইহার ব্যভিচার দেখা যায় তাহা শিক্ষার ফল সুতরাং বিরল। এখন দেখ ত্যাগস্বীকার বলিতে কি বুঝায়? না, জগতের যে সমস্ত কোমল ভাব মনকে অধিকার করিয়া আছে,যাহা আশুতৃপ্তিকর সেই গুলির সম্বন্ধত্যাগ। ইহা অবশ্য কঠিন ব্যাপার। কারণ যে প্রকৃতি আমূলত কঠোরতা দূর হইতে দূরে পরিহার করিয়া আসিয়াছে আশুতৃপ্তিকর কোমল ভাবের বিনিময় তাহার কিছুতেই সহ্য হয় না। ফলত ইহা যদিও দুষ্কর কিন্তু অসুকর নহে। এস্থলে এই বিরোধি ব্যাপারের মীমাংসা আছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে আমূলত একটী কথা প্রয়োগ করিয়াছি। তাহার উদ্দেশ্য এই যে বাল্যই অভ্যাসের প্রকৃত কাল। বাল্যের সংস্কার পাষাণে অঙ্কিত রেখার ন্যায় কিছুতেই যায় না। যদি বাল্যকাল হইতে কঠোর ভাবের সহিত পরিচয় হয়, তাহা হইলে যৌবনে ত্যাগস্বীকারের কিছুমাত্র যন্ত্রণা নাই। এই জন্য প্রাচীন ভারতে বাল্যেই ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা ছিল। শৈশব কাল হইতে কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি প্রবৃত্তি গুলিকে দমন করিবার জন্য গুরু-মুখাপেক্ষী ভিক্ষান্ন, তেজোধাতু নিরোধও বিলাসকলা পরিহারের ব্যবস্থা দেখা যায় এবং আপনার স্বার্থকে তুচ্ছ করিয়া অন্যের স্বার্থকে বলবৎ করিতে দেখা যায়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বাল্য হইতে এইরূপে পৃথিবীর কঠোর ভাব সকল আয়ত্ত করিত এবং ইহারই বলে যৌবনের উদ্দাম প্রবৃত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিত।

এখন বলিতে পার নৈতিক কঠোরতা বাল্যে কিরূপে সহনীয় হয়। আমি এই টুকু বুঝাইবার নিমিত্ত প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের কথা তুলিয়াছি। পূর্ব্বে ধর্ম্ম ও নীতিকে এক পর্য্যায়ে বুঝিত। তখন বাল্য হইতে কেবল যে ইহার শিক্ষা হইত তাহা নহে শিক্ষার সহিত অনুষ্ঠানও অপরিহার্য্য ছিল। অভ্যাসের বল অতি চমৎকার। আজ আমার যে কার্য্য ভাল লাগিতেছে না অভ্যাসের বলে কালে তাহাই প্রীতিকর হইয়া থাকে। বিশেষত বাল্যে এই অভ্যাস আরও সহজে হয়। একটা লতা বা শাখাকে অপরিণত অব-

ন্যায় তুমি যে দিকে ইচ্ছা নোওাইতে পার কিন্তু পরিণত হইলে আর পরিবে না। ফলত মনুষ্যের প্রকৃতিও তদ্রূপ। মন যখন তরুণ থাকে তখন তাহাকে যে দিকে প্রসর দিতে চাও পারিবে কিন্তু যখন যৌবনের নানাভাব আসিয়া তাহার উপর আধিপত্য করিতে থাকে, যখন সে সেই সকল ভাবে পুষ্ট হয় তখন তাহাকে নম্রত করা বড় সুখসাধ্য হয় না। অতএব বাল্যই কঠোরতা সহ্য হইবার প্রকৃত কাল।

কিন্তু এখনকার সমাজের অবস্থা কি শোচনীয়। অবশ্য, লোকে ইহা বুঝিয়াছে যে বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু সূক্ষ্ম বুঝিতে গেলে ধর্ম্মের শিক্ষাতে নয় অনুষ্ঠানেই কঠোরতা। বর্ত্তমানে তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া থাকে। একে তো এইরূপ কঠোরতা শিক্ষায় উপেক্ষা তার উপর আবার ভীষণ বাল্য-বিবাহ। সুতরাং এই ভোগপ্রবণ কালে চরিত্র কিরূপে সম্ভব হইবে। আর যদি চরিত্রই না থাকে তবে পৃথিবীতে ধর্ম্মের সার্থকতা কি, উপযোগিতাই বা কি।

শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ব্যাখ্যান।

আমি আজ কি বলিতে আসিয়াছি। আজ সকলে এখানে আনন্দধামের চির-নূতন চির-পুরাতন বার্ত্তা শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আমি কে। আমি কি জানি। আমার বলিবার কি অধিকার আছে। আমি গত বর্ষে কি কাজ করিয়াছি যে নববর্ষের নূতন কাজে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সকলকে উৎসাহ দিতে পারি, এমন কি অমৃত সঞ্চয় করিয়াছি যে, আজ নববর্ষের দিনে আপন হৃদয়ের আশার অংশ সকলকে বিতরণ করিতে আসিয়াছি। আমি কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিতে চাহি না। আমি কিছুই করি নাই, আমি এই পৃথিবীতেই ছিলাম— তবে আজ আমি আনন্দধামের বার্ত্তা কি বলিতে আসিয়াছি।

কেহ হয়ত আমাকে বলিবেন তুমি বুঝি শুনিয়া আসিয়াছ! যে সকল মহাপুরুষেরা ব্রহ্মধামে বাস করিতেছেন তুমি বুঝি তাঁহাদের কাছে কিছু শুনিয়া আসিয়াছ, মুখে মুখে সকলের কাছে তাই প্রচার করিতে চাও। তাই বা কই শুনিলাম। বিনীত হইয়া ধৈর্য্য ধরিয়া তাই বা শুনিতে পারিলাম কই। আমি আপনার কথা শুনাইতেই ব্যস্ত তাঁহাদের কথা শুনিতে আমি অবসর পাইলাম কই। তবে আমি আনন্দধামের বার্ত্তা কি বলিতে আসিয়াছি!

তবে কি যে-সকল কথা সকলেই জানে সেই কথাই আমি সকলকে জানাইতে আসিয়াছি! মনুষ্যেরা কোন্ বৃহৎ সত্য না জানে! সত্যের মহত্ত্ব, প্রেমের মহত্ত্ব, দয়ার মহত্ত্ব, এ কে না জানে! অথবা, এ কেই বা জানে! এ সকল কথা যদি জানাই হইবে তবে চিরদিন ধরিয়া বলিতে হইতেছে কেন। সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেরই জয় হয় মিথ্যার জয় হয় না, এ কথা চির দিন শুনিতেছি তবু বুঝিতেছি না কেন? আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি, আত্মবৎ সর্ব্বজীবকে যিনি দেখেন তিনিই বাস্তবিক দেখেন এ এ কথা কত দিন হইতে শুনিতেছি কিন্তু অনুভব করিতেছি না কেন? এই সকল পুরাতন কথা প্রতিদিন মানুষকে নূতন করিয়া শিখিতে হইতেছে, তবে ইহাদিগকে পুরাতন কথা জানাকথা কি করিয়া বলিব। যিনি জানেন তিনিই বলুন, যিনি হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করেন তিনিই বলুন, আমি সম্পূর্ণ

জানি না, আমি সম্পূর্ণ অনুভব করি না, আমি বলিতে পারিব না।

তবে আমি কি বলিব। সাধনার প্রিয়-নিকেতন, সাধুদিগের প্রিয় বিহার-ভূমি, অন্তর্য্যামী পরম পুরুষের চির বিরাজস্থান আত্মার যে নিভৃত নিলয়, সেই খানেই যাঁহাদের নিত্য যাতায়াত আছে, সেইখান হইতে যাঁহারা জ্যোতিষ্মান হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর তাঁহারা কিছু বলিতে পারিবেন—আমি এইমাত্র সংসার হইতে আসিতেছি, সংসারের ধূলি লইয়া আসিতেছি, ক্ষুধা নিদ্রা নিন্দা গ্লানি বাসনা লালসা স্বার্থপরতা প্রমোদ কোলাহলের আবর্ত্তের মধ্য হইতে আসিতেছি, এখনও হৃদয় ধৌত করিয়া আসি নাই, এখনও শুচি হই নাই, শান্ত হই নাই, আমি আনন্দধামের বার্ত্তা কি বলিতে পারি।

সত্য প্রচার করিবার অধিকার সকলের নাই। সত্য অনাহূত কাহারও কাছে আসে না। সত্য উপার্জ্জন করিতে হয় লাভ করিতে হয়, কৃষকেরা যেমন করিয়া ফললাভ করে শস্যলাভ করে তেমনি করিয়া সত্য লাভ করিতে হয়। সত্য স্বপ্নের মধ্যে নাই, চিন্তার মধ্যে নাই, সত্য কার্য্যের মধ্যে আছে। কারণ সত্য ঈশ্বরের সত্য, সত্য আমার সৃষ্টি নহে। ঈশ্বরের কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের নিয়ম পালন করিয়া চলিলে তবে সত্য লাভ করিতে পারা যায়। তুমি যথার্থ ভালবাস, তবে ঈশ্বরের ভালবাসা বুঝিতে পারিবে; তুমি দয়া কর, ঈশ্বরের করুণা অনুভব করিতে পারিবে; তুমি সত্যাচরণ কর, ঈশ্বরের জগৎ তোমার বিরুদ্ধে কথাটি কহিবে না। সেবকের নিকটে প্রভুর সংবাদ পাওয়া যায়, ঈশ্বরের যিনি সেবক তাঁহার কাছে ঈশ্বরের সত্য পাইবে। ঈশ্বরের সেবক কে? যিনি জগতের সেবা করেন, যিনি পিতামাতার সেবা করেন, প্রতিবেশীকে সাহায্য করেন, যিনি সমস্ত জগৎকে প্রীতি করেন, আর যিনি কেবল আত্মসেবা করেন তাঁহার কাছে সংশয়ের কথা শুনিবে, আনন্দের কথা শুনিবে না; তাঁহার কাছে বৃহত্ত্বের প্রতি অবিশ্বাস ও ক্ষুদ্রত্বের প্রতি বিশ্বাস, জগতের প্রতি সন্দেহ ও নিজের প্রতি প্রত্যয় শুনিতে পাইবে। তিনি বলেন, বিশ্বের যাহাতে চলে আমার তাহাতে চলে না, তিনি বলেন প্রেম জগতের নিয়ম কিন্তু স্বার্থপরতা আমার নিয়ম।

সত্যের চির-উৎসারিত অনন্ত প্রস্রবণের সহিত যাঁহাদের হৃদয়ের যোগ আছে তাঁহারাই সত্য পাইতে পারেন। হৃদয়ের মধ্যে বৃহৎ গহ্বর খনন করিয়া যে, আমরা কিছুদিন ব্যবহারের মত সত্য ধরিয়া রাখিতে পারি তাহা পারি না। সত্যের চির-প্রবাহিত প্রস্রবণের সহিত আমাদের হৃদয়ের চিরযোগ রক্ষা করিতে হইবে। সূর্য্যের নিকট হইতে যেমন আমাদিগকে চিরদিন উত্তাপ আলোক গ্রহণ করিতে হইতেছে, কোন কালেই বলিতে পারি না, "যথেষ্ট হইয়াছে, আর আবশ্যক নাই, এখন কিছুদিন চলিয়া যাইবে, এখন কিছুদিন আমি আপন উত্তাপে উত্তপ্ত থাকিব, আপন আলোকে চারিদিক আলোকিত করিয়া রাখিব"—তেমনি দয়ার জন্য, প্রেমের জন্য সত্যের জন্য চির দিন অনন্তের দিকে অঞ্জলি প্রসারণ করিয়া রাখিতে হইবে। বায়ু পাইবার জন্য যেমন অবিশ্রাম বায়ু-প্রবাহে বাস করিতে হইবে, আলোক পাইবার জন্য যেমন অবিচ্ছিন্ন আলোক-তরঙ্গের সহিত চক্ষুর যোগ থাকা চাই, তেমনি সত্যের জন্য চিরদিন অনন্ত সত্যের সহিত লগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে, অসীম সত্যের মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে।

কে সত্য চাহেন! তিনি হৃদয়ের সহিত বলুন, অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যো-

তির্গময়, মৃত্যোর্ম্মামৃতংগময়। আবীরাবীর্ম্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং। অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। এই সংসারের চতুর্দ্দিকে এত অসত্য, যে প্রতি দিন অভ্যাস বশতঃ সত্যের প্রতি ব্যাকুলতাও আমাদের লোপ হইয়া যাইতেছে। এই জন্য ঋষি নিতান্ত ভীত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের প্রকাশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন "হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও!" আমাদের মধ্যে কে এমন আছেন যিনি যথার্থ আগ্রহের সহিত বলিতে পারেন "আমি কোন অসত্যই চাহি না।" বাস্তবিকই কি কোন অসত্যকেই আমরা প্রিয় বলিয়া বরণ করি নাই, আমাদের জীবনের অবলম্বন করি নাই, অসত্যের প্রেমে অভিভূত হইয়া কি আমরা কোন সত্যের প্রতি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিমুখ হই নাই? তবে আমরা মুখে কেবল "অসতোমা সদ্গময়" প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়া সত্য লাভের অধিকারী হইব কিরূপে? আমাদের এখানে কে এমন আছেন যিনি হৃদয়ের সহিত বলিতে পারেন "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্" যাহার দ্বারা আমি অমৃত না হইব তাহা লইয়া আমি কি করিব! তা যদি না পারিলাম তবে মুখে "মৃত্যোর্ম্মামৃতংগময়" উচ্চারণ করিয়া অমৃতলাভের অধিকারী হইব কি করিয়া? যাঁহারা হৃদয়ের ব্যাকুলতার সহিত একদিন বলিয়াছিলেন "অসতোমা-সদ্গময়" তাঁহারাই আর একদিন বলিয়াছিলেন

"শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

শোন শোন অমৃতের পুত্রেরা শোন, শোন দিব্যধামবাসীগণ শোন, আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি যিনি অন্ধকারকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছেন।—একথা কি আমরা বলিতে পারি!

কিন্তু তবুও ত আমরা তর্ক করিতে ছাড়ি না! তবুও ত আমরা বলিয়া থাকি, অনন্তের মধ্যে সুখ নাই, প্রীতি নাই, অনন্তকে কাল্পনিক সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া আয়ত্তাধীন করিলে তবে তাঁহাতে সুখ পাই, তবে তাঁহাকে প্রীতি করিতে পারি। যাঁহাকে আমি কখন অন্বেষণ করি নাই, যাঁহাকে পাইবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে ব্যাকুলতা অনুভব করি নাই, তাঁহাকে পাইয়া সুখ নাই একথা বলিবার অধিকার আমাদের কি আছে! যাঁহারা তাঁহাকে জানিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—ভূমাই সুখস্বরূপ, অল্পে সুখ নাই। আমরা আমাদের অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতা লইয়া যে কথার প্রতিবাদ করিতে যাই কোন্ সাহসে! এ কথা কে অস্বীকার করে যে, অনন্ত স্বরূপকে আয়ত্তাধীন করা যায় না।—কিন্তু তিনি আমাদের আয়ত্তের অতীত বলিয়াই তাঁহাতে আমাদের একমাত্র সুখ। যাহা আমরা পাই তাহাতে আমাদের স্থায়ী সুখ নাই, যাহা আমরা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি তাহা আমরা ত্যাগ করিতে চাই, চিরদিন পাইয়া যাহাকে আমরা চিরদিন শেষ করিতে পারি না তাহাতেই আমাদের আনন্দ। অতএব কে তর্ক করিতে আসিয়াছে যে, অনন্তে সুখ নাই, সীমাতেই সুখ। হায় আমরা সত্য চাহি না, অথচ সত্যকে লইয়া ছেলেখেলা করিতে চাই!

হে পরমাত্মন্—এ সংসারে কেবল এক-

মাত্র প্রার্থনা আছে, আর কোন প্রার্থনা নাই, সেই এক প্রার্থনা মনুষ্যহৃদয়ের সমুদয় প্রার্থনার সমষ্টি—সেই এক প্রার্থনায় মানবের সমুদয় আশা, সমুদয় হৃদয় বিলীন হইয়া তোমার নিকটে উত্থিত হইতেছে। সে প্রার্থনা কেবল

"অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতংগময়।"

এ সংসারে আমাদের চারিদিকে সহস্র অসত্য সত্যের ভাণ করিয়া আমাদের হৃদয়-সিংহাসন লাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। আমরা অন্ধ, আমরা হীনবুদ্ধি, আমরা আলেয়ার আলোকে প্রবঞ্চিত হইয়া, মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া, সংশয়ের মধ্যে পথভ্রষ্ট হইয়া ভীত শিশুর মত কাঁদিয়া তোমার কাছে আর কি চাহিতে পারি, তোমার কাছে মানবের একমাত্র এই প্রার্থনা "অসতোমা সদ্গময়।" চারিদিকে অসত্য আমাকে সত্যে লইয়া যাও।

আমরা যে অন্ধকার ভালবাসি। অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা নিদ্রাসুখ লাভ করিতে চাই। আলোকে আমাদের আবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলে, আমাদের ক্ষুদ্রতা আমাদের হৃদয়ের কলঙ্ক সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সহসা তোমার চিরজাগ্রত নেত্র দেখিতে পাই—দেখিতে পাই আমাদের কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, আমাদের মানবজীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তোমার আদেশ অসম্পন্ন রহিয়াছে—এই জন্য আমরা আলোক চাহি না, আমরা আত্মশ্লাঘা চাই, আত্মগ্লানি চাহি না, এই জন্য আমরা আপনাকে আপনি অন্ধ করিয়া রাখিতে চাই—অবশেষে বিপদ কখন্ আসিয়া উপস্থিত হয়, অমঙ্গলরাশি কখন্ আসিয়া আক্রম করে, বিনাশ কখন আসিয়া আক্রমণ করে জানিতেও পারি না। এই জন্য মানবের পক্ষে এমন প্রার্থনা আর কি হইতে পারে "তমসোমা জ্যোতির্গময়।" চারিদিকে অন্ধকার আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।

অমৃত কি আমরা জানি না, অমৃত কোথায় আমরা জানি না। মৃত্যুর মধ্যেই আমরা অমৃত অন্বেষণ করিয়া বেড়াই অবশেষে নিরাশ হইয়া অমৃতের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। মৃত্যুকেই অমৃতের স্থলাভিষিক্ত করিয়া রাখিতে চাই। একবার দাও—একবার অমৃতের আস্বাদ দাও, তাহা হইলে মৃত্যুকে চিনিতে পারিব। তাহা হইলে মৃত্যুকে অমৃত বলিয়া ভ্রম হইবে না। তাহা হইলে ছদ্মবেশী বিনাশের হাত হইতে রক্ষা পাইব। এই জন্য মানবের এই একমাত্র প্রার্থনা আছে "মৃত্যোর্ম্মামৃতংগময়" চতুর্দ্দিকে মৃত্যু, আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।

আবীরাবীর্ম্ম এধি। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। কারণ, তুমি প্রকাশিত হইলেই অসত্য, অন্ধকার, মৃত্যু সমস্ত দূর হইবে। যেমন কুজ্ঝটিকা সূর্য্যের প্রকাশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, আবার সেই সূর্য্যের প্রকাশেই কুজ্ঝটিকা ক্রমে দূর হইয়া যায়, তেমনি অসত্য, অন্ধকার, মৃত্যু মানবের নেত্র হইতে তোমার প্রকাশকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে আবার তোমার প্রকাশেই সেই অসত্য, অন্ধকার, মৃত্যু দূর হইয়া যাইবে। হে স্বপ্রকাশ, তুমি আপনিই আপনাকে প্রকাশ করিবে।

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

হে রুদ্র, প্রথমে তোমার রুদ্র মুখের দ্বারা আমাকে উদ্বোধিত করিয়া দাও, আমার মোহ-নিদ্রা দূর করিয়া দাও। হে রুদ্র, আমার যাহা কিছু বিনাশের যোগ্য তোমার বজ্রের দ্বারা অগ্রে তাহা বিনাশ কর, তাহার পরে তোমার দক্ষিণ মুখ, তোমার প্রসন্ন প্রেমমুখের দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি।

---

১৮ কার্ত্তিক—অদ্য বয়সী সাহেবের উপদেশ (Langham Hall Pulpit Vol III No 34. Theism its Principles and Beliefs) পাঠ করি। বয়সী সাহেব এই উপদেশে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দেখাইয়াছেন যে (Lord Herbert of Cherbury) প্রকৃত ব্রাহ্ম ছিলেন, নীরস দার্শনিক একেশ্বরবাদী (Deist) ছিলেন না। তিনি তাহার পুস্তক "DeVeritate" প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিকট যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে অতিশয় ভক্তিমান লোক বলিয়া বোধ হয়। তিনি এই পুস্তক প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার স্পষ্ট আদেশ চাহিয়াছিলেন। তিনি যে প্রকার আদেশ চাহিয়াছিলেন অর্থাৎ আকাশে কোন চিহ্ন সে প্রকারে ঈশ্বর তাঁহার আদেশ প্রকাশ করেন না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে সন্দেহ নাই। Lord Herbert of Cherbury ইংরাজ ব্রাহ্মদিগের পিতামহ বলিতে হইবে। তিনি খ্রীষ্টাব্দ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে জীবিত ছিলেন।

২৬ কার্ত্তিক—অদ্য ভারতবর্ষে প্রাপ্ত বয়সী সাহেবের শেষ সম্বাদ পাঠ করি। তাহাতে এই উৎকৃষ্ট বাক্য আছে, "For some good purpose not always seen by us, evil befalls us which we cannot prevent or avert. Nothing in heaven or earth can reconcile us to such afflictions but knowiug or believing that a loving hand has sent them that a love greater and a wisdom higher than our own are the secret source of all that worries or distresses us." "যে মন্দ আমরা কোন মতে এড়াইতে পারি না সে মন্দ আমাদিগের মঙ্গলের জন্য প্রেরিত হয়। কিন্তু এই মঙ্গল অভিপ্রায় আমরা সকল স্থলে বুঝিতে পারি না। যদ্যপি আমরা ইহা না বিশ্বাস করি যে এক প্রেমময় হস্ত এই সকল দুঃখ প্রেরণ করে এবং আমাদিগের জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান এবং আমাদিগের প্রেম অপেক্ষা উচ্চতর প্রেম আমাদিগের দুঃখ ও কষ্টের নিগূঢ় কারণ তাহা হইলে তাহা সহ্য করিতে আমাদিগের কখন মন যাইত না।"

২৮ কার্ত্তিক—অদ্য প্রাতে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। যখন তাঁহার সহিত সাক্ষ্যাৎ করিতে যাই তখন তাঁহার সহিত এখানকার পাণ্ডা এক জন দেখা করিতে আইসে। এখানকার পাণ্ডারা গণ্ড মূর্খ। কেবল দৈ চিড়া খাইতে ভাল বাসে। শুনিলাম তাহারা বেদ পড়ে, তাহার পর জানা গেল যে আসল বেদ পাঠ করে না। ভবদেবের কর্ম্মকাণ্ডীয় পদ্ধতির বৈদিক মন্ত্র সকল অভ্যাস করে। তাহার অর্থ পর্য্যন্ত বুঝে না। পাণ্ডাদিগের মধ্যে দুই একজন লোক বিদ্বান আছেন।

২৯ কার্ত্তিক—অদ্য "Life of Macaulay by George Trevelyan" পাঠ করি। গ্রন্থকার মেকলের ভাগিনেয় "নরাণাং মাতুল ক্রমঃ।" মেকলের লেখার স্বচ্ছ উজ্জ্বল জীবন্ত রসাত্মক ভাব তাঁহার ভাগিনেয়ের লেখাতেও অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই পুস্তকে অদ্য মেকলের শৈশব বৃত্তান্ত পাঠ করিলাম। মেকলে এচোড়ে পাকা ছেলে ছিলেন কিন্তু অনেক এচোড়ে পাকা ছেলে এচোড়ে পাকিয়া যেমন শীঘ্র বিস্বাদ হইয়া যায় মেকলে এরূপ ছিলেন না। তাঁহার বয়সের সঙ্গে তাঁহার স্বাদুতা বৃদ্ধি হইয়াছিল, এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে পরিশেষে তাহাকে কামড়ে কামড়ে খেয়ে লোকের সাধ মিটিত না।

৩০ কার্ত্তিক—অদ্য প্রাতে বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক ও বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে ধাড়ওয়া নদীতীরে গিয়া ব্রহ্মোপাসনা করি। মল্লিক মহাশয় গান করেন। উপাসনার পর বক্তৃতা কালে আমি বলি আমরা "কি অপবিত্র! প্রাতঃসমীরণ কি পবিত্র! প্রাতঃসমীরণ আমরা নিশ্বসন করিবার উপযুক্ত নহি।" বৈকালে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা হয়। অদ্য হইতে নিয়ম হইল যে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা চারিটার সময় হইবে। এখানকার গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের সুবিধার জন্য এই নিয়ম করা হইল।

একাদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
আষাঢ় ৫৭ ব্রাহ্ম সম্বৎ
৫১৫ সংখ্যা
১৮০৮ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৩ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

আচার্য্যের উপদেশ।*

কোন না কোন সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কোন না কোন প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে মনুষ্য-ভ্রাতারা একত্র সমাগত হয়। আমরা এখানে আজ কি সম্বন্ধ-সূত্রে সমাগত হইয়াছি—আমাদের প্রয়োজনই বা কি? যে সম্বন্ধ-সূত্রে এখানে আজ আমরা সমাগত হইয়াছি তাহা অতি উচ্চতর সম্বন্ধ। তাহা সেই সম্বন্ধ যাহা আত্মার সহিত আত্মারই সম্ভবে! শরীরের সহিত মনের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা আমাদের কাহারো জানিতে অবশিষ্ট নাই; শরীরে আঘাত লাগিলেই মনে আঘাত লাগে, শরীর ক্লান্ত হইলেই মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, শরীর সুস্থ হইলেই মন প্রফুল্ল হয়। শরীর এবং মনের মধ্যে এই যে সম্বন্ধ ইহাকে আমরা বলি—প্রাণের সম্বন্ধ। কিন্তু আত্মাতে আত্মাতে যে সম্বন্ধ তাহা আরো উচ্চতর সম্বন্ধ—তাহা বিশুদ্ধ প্রেমের সম্বন্ধ। প্রাণ-সূত্রে যেমন মন শরীরে আকৃষ্ট হয়, বিশুদ্ধ প্রেম-সূত্রে সেইরূপ আত্মা আত্মাতে আকৃষ্ট হয়। পুষ্প যেমন বৃন্তের বন্ধন ছাড়াইয়া উঠিয়া ঊর্দ্ধে বিকসিত হয়, আত্মা সেইরূপ প্রাণের বন্ধন ছাড়াইয়া উঠিতে পারিলেই জয়যুক্ত হয়, তখনই তাহা স্বকীয় মহিমায় বিকসিত হয়—তখনই তাহা হইতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের দীপ্তি এবং বিশুদ্ধ প্রেমের লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হয়। আত্মার প্রতি মনুষ্যের ভালবাসা স্বভাব-সিদ্ধ। মনুষ্য মনুষ্যের শরীর-মন দেখিতে চায় না—আত্মা দেখিতে চায়; নশ্বর শরীরের উপর অবিনশ্বর আত্মাকে জয়-যুক্ত দেখিতে চায়। যে মনুষ্যকে আমরা দেখি যে, তাঁহার নশ্বর শরীর অবিনশ্বর আত্মাকে শৃঙ্খল-বদ্ধ করিয়া পথে ঘাটে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার প্রতি আমরা ধিক্কার বর্ষণ করি; কিন্তু যাঁহাকে দেখি যে, তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা শরীর-মনকে বিশুদ্ধ প্রেমে বশীভূত করিয়া চালাইতেছে—তাঁহার প্রতি আমরা আন্তরিক ভক্তির সহিত মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারি না; আত্মার প্রতি মনুষ্যের এইরূপ আন্তরিক ভালবাসা।

* এই উপদেশ শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে পঠিত হইয়াছিল। সং

আত্মার প্রতি মনুষ্যের এতই যদি ভালবাসা, তবে কেন তাহার উদ্দেশে অর্দ্ধেক পথ যাইতে না যাইতে মনুষ্যের চরণ স্খলিত হইয়া যায়। প্রেমের জন্য মনুষ্য বেশী অধৈর্য্য হয় বলিয়া পথ ভুলিয়া যায়,—তাহার পর প্রেমের অন্বেষণ না পাইয়া নিরুৎসাহ হয়,—এইরূপে মনুষ্য বিপাকে পড়িয়াই আত্মা হইতে পরাঙ্মুখ হয়,—ইচ্ছার অভাবে নহে, কিন্তু শক্তির অভাবে। আত্মার প্রতি যে, কাহারো অনিচ্ছা হয় না, তাহা নহে, কিন্তু তাহার মূল অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অশক্তিই সে অনিচ্ছার কারণ। যে অমৃত-লাভে অক্ষম সে-ই বলে "আমি অমৃত চাই না," কিন্তু তাহা বলিয়া বাস্তবিকই যে সে অমৃত চায় না—তাহা নহে; মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া কেহ যদি বলেন "আমি আত্মাকে চাই না," তবে সে কথা মুখের কথা—কাজের কথা নহে। আত্মাকে আমরা যে, চাই না তাহা নহে—আত্মাকে আমরা পাই না ইহাই ঠিক; কেন পাই না? আমাদের ধৈর্য্য নাই; আমরা প্রেমের আশু চরিতার্থতার জন্য ব্যস্ত হই; আমাদের সম্মুখে মরীচিকা—পার্শ্বে স্বচ্ছ সরোবর; কিন্তু আশু পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য আমরা এত ব্যস্ত যে, পার্শ্বে ফিরিয়া দেখিবার আমাদের অবকাশ নাই—মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সম্মুখেই ধাবিত হইতেছি। শোভন মুখাকৃতি, পুষ্পিত বাক্য, সুন্দর অঙ্গ-ভঙ্গ ও চাল-চলন—এই গুলি দেখিবা-মাত্র অমনি আমাদের মন বলিয়া উঠে যে, আত্মা ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে। ক্রমে বহিঃশোভাতেই আত্মাকে অবলোকন করা আমাদের অভ্যাস পাইয়া যায়; আত্মার যেখানে নিজ নিকেতন সেখানে আমরা বহিঃশোভা দেখিতে পাই না—তাই সেখানে আত্মাকেও দেখিতে পাই না—অথচ সেই খানেই আত্মা চিরস্থায়ী। যাঁহারা অমিশ্র প্রেম চা'ন তাঁহারাই আত্মাকে দেখিতে পা'ন, যাঁহারা প্রেমের কৃত্রিম বেশ-ভূষা চা'ন তাঁহারা মায়াবিনী অবিদ্যাকে আত্মার সিংহাসনে আরূঢ় দেখিলেই তাঁহাদের চক্ষু পরিতৃপ্ত হয়। মনুষ্যের উন্নত-গ্রীব শরীর আত্মারই প্রতিমূর্ত্তি, মনুষ্যের প্রফুল্ল মুখচ্ছবি আত্মারই ছবি, মনুষ্যের তাল-মান-লয়-শুদ্ধ কথা-বার্ত্তা ও ভাব-ভঙ্গী আত্মারই গীতোচ্ছ্বাস; কিন্তু আত্মার সে প্রতিমূর্ত্তি, আত্মার সে ছবি, আত্মার সে গীতোচ্ছ্বাস সাক্ষাৎ আত্মা নহে; তাই অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, আমরা আত্মার ঐ সব বহিরাবরণ গুলিকে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছি ইতিমধ্যে প্রকৃত আত্মা তাহার মধ্য-হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে—ও আত্মার বেশ ধরিয়া মায়াবিনী অবিদ্যা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে; অবিদ্যার পাপ-প্রভাবে ক্রমে যখন সে প্রতিমূর্ত্তি ধূলি-মূর্ত্তি হইয়া যায়, সে ছবি পরিম্লান হইয়া যায়, সে গীতোচ্ছ্বাস বে-লয় বে-তালা এবং বে-সুরা হইয়া যায়, তখন যদি আমাদের ভুল ভাঙিয়া যায় তাহা হইলেও রক্ষা। এক জন দরিদ্র প্রজা অনেক কষ্টে যৎকিঞ্চিৎ উপহার-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাজ-দর্শনার্থে আসিয়াছে—মাঝ-পথে সে এক জন সামান্য কর্ম্মচারিকে রাজা মনে করিয়া তাহার চরণে সেই দ্রব্য-গুলি সমর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিল,—এত অধৈর্য্যে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। আত্মাই যখন আমাদের লক্ষ্য তখন আত্মা পর্য্যন্ত পৌঁছানো চাই, নহিলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইবে, দেবোদ্দিষ্ট যজ্ঞ-ভাগ অসুর-কর্ত্তৃক অপহৃত হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শরীর এবং মনো মধ্যে যেমন প্রাণের টান, আত্মার আত্মা

সেইরূপ বিশুদ্ধ প্রেমের টান। মনে মনে আমরা বিশুদ্ধ প্রেমের পক্ষপাতী হইলেও অনেক সময় আমরা পথ ভুলিয়া প্রাণের মায়াজালে জড়াইয়া পড়ি। বিশুদ্ধ প্রেম এক সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিল যে শক্রকে ক্ষমা করিবে, কিন্তু এখন আমরা দৈহিক প্রাণের অধিকারে আসিয়াছি—তাহাকে আমাদের ভয় করিয়া চলিতে হইতেছে ; প্রেম বলিয়াছে ক্ষমা করিতে—কিন্তু প্রাণ চায় বিনাশ করিতে—এখন আর আমরা প্রেমের কথায় কর্ণপাত করিতে পারি না। শক্র-বিনাশ দ্বারা যখন প্রাণ পরিতুষ্ট হইল, তখন আমরা কাঁদিতে বসিলাম "হায়! প্রেমের কথা না শুনিলাম কেন!" পৃথিবীতে প্রেম অপেক্ষা প্রাণের আদর অধিক। মন এবং শরীরের মধ্যে প্রাণের যেরূপ প্রবল বন্ধন—পৃথিবীতে আত্মায় আত্মায় সেরূপ প্রেম-বন্ধন খুঁজিয়া পাওয়া ভার। কিন্তু প্রাণের বন্ধন বালির বাঁধ—প্রেমের বন্ধন অসীম জগতের ভিত্তিমূল। প্রাণের বন্ধন মনুষ্যের ইহ জীবনকেও ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না—বিশুদ্ধ প্রেমের বন্ধন মনুষ্যের ঐহিক এবং পারত্রিক সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া আপনার প্রভাব সম্বর্দ্ধন করে। প্রাণ এবং প্রেমের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, প্রাণ-ধারণ যেমন শরীরের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, প্রেম-ধারণ সেইরূপ আত্মার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ; আর, স্বাস্থ্য যেমন প্রাণের অনুকূল, ধর্ম্ম সেইরূপ বিশুদ্ধ প্রেমের অনুকূল; আবার, অস্বাস্থ্য যেমন প্রাণের প্রতিকূল, অধর্ম্ম সেইরূপ প্রেমের প্রতিকূল। প্রভেদ এই যে, প্রাণ কেবল শরীরেরই সঙ্গের সঙ্গী—আত্মার নহে, এ জন্য তাহা অস্থায়ী ; বিশুদ্ধ প্রেম আত্মার সঙ্গের সঙ্গী—এ জন্য তাহা চিরস্থায়ী। রোগের ঔষধ অনেক আছে ; কিন্তু মৃত্যুর কেবল এক ঔষধ—বিশুদ্ধ প্রেম। বিশুদ্ধ প্রেম সাক্ষাৎ অমৃত—তাহাতে আত্মা সুস্নিগ্ধ সুপ্রশান্ত সুপ্রসন্ন ও অটল বল-শালী হয়—এরূপ হয় যে, মৃত্যু—ভয়ে তাহার নিকটে আসিতে পারে না। বিশুদ্ধ প্রেমের অভাবে আত্মার যে কি হীন-দশা হয় তাহা আর বক্তব্য নহে,—তখন আত্মা কামে কলুষিত ক্রোধে অন্ধ, লোভে লালায়িত এবং মোহে অভিভূত হইয়া, সর্ব্বদাই উন্মত্ত—সর্ব্বদাই অপ্রসন্ন—সর্ব্বদাই মলিন—সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়—শান্তির মুখ এক মুহূর্ত্তও দেখিতে পায় না।

অতএব বিশুদ্ধ প্রেমের সম্বন্ধ-সূত্রে আমরা যে আজ এই পবিত্র স্থানে সমাগত হইয়াছি ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। এখন আমাদের কি প্রয়োজন—কি কর্ত্তব্য কার্য্য—তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করি।

বিশুদ্ধ প্রেমের সম্বন্ধ-সূত্রেই আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি, বিশুদ্ধ প্রেমের চরিতার্থতা-সাধনই আমাদের প্রয়োজন। প্রতিজনে একবার আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন "তুমি কি চাও—কঠোর কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলায় বদ্ধ থাকিতে চাও—না তাহা হইতে মুক্তি-লাভ করিতে চাও?" পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গেরা কেমন দেখ-দেখি প্রকৃতির ক্রোড়ে নিরুদ্বেগে শয়ান আছে—আমরা কেন তাহা পারি না? আমাদের শৈশবাবস্থায় আমরা তো বেস্ ছিলাম—তখন মাতা ভিন্ন আর কাহাকেও জানিতাম না, তখন অগ্নি এবং কঙ্কন—সর্প এবং রজ্জু—আমাদের কাছে সমান ছিল, আমাদের কোন ভয় ছিল না, আশঙ্কা ছিল না, ভাবনা ছিল না! তখন তো আমরা প্রকৃতির ক্রোড়ে দিব্য নির্ভয়ে শয়ান ছিলাম—এখন কেন আমরা প্রকৃতিকে এত ভয় করিতেছি—প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার

উপায় অন্বেষণ করিতেছি? শিশুর অবস্থা মন্দ কি ছিল? এ কথার মীমাংসা এই-রূপ;—এ কূলের সহিত ও-কূলের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মাঝ-গঙ্গার সহিত উভয়ের কাহারো সাদৃশ্য নাই,—বীজের সহিত শস্যের সাদৃশ্য আছে কিন্তু শাখা-প্রশাখা-কণ্টকের সহিত উভয়ের কাহারো সাদৃশ্য নাই; শিশুর সরল ভাবের সহিত বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেমের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মাঝ-পথের শুষ্ক বিজ্ঞানের সহিত উভয়ের কাহারো সাদৃশ্য নাই। শিশু কার্য্য-কারণের অভ্যন্তরে বাস করিতেছে অথচ কার্য্য-কারণের কোন তর্কই রাখে না—অবিতর্কে চন্দ্র ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে—প্রজ্বলিত অগ্নিকে মুষ্টি-গত করিতে যায়। বিশুদ্ধ-প্রেমও কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলাকে অগ্রাহ্য করে—প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে; তাই বিশুদ্ধ-প্রীতি শাস্ত্রে অহেতুকী বলিয়া উক্ত হইয়াছে;—অহেতুকী অর্থাৎ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত; শিশুর অকৃত্রিম সরল-ভাবের সহিত বিশুদ্ধ প্রেমের এইরূপ সাদৃশ্য; কিন্তু দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও যেমন—প্রভেদও তেমনি; বীজ মৃত্তিকা-গর্ব্ভে অন্ধকারে আবৃত—শস্য আলোকে উদ্ভাসিত; শিশুর অমায়িকতা অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন; বিশুদ্ধ প্রীতির অমায়িকতা জ্ঞানজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্। শিশুর অমায়িকতা এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেমের অমায়িকতা এই দুই কূলের মধ্যস্থলে বিজ্ঞানের নদী প্রবাহিত হইতেছে। শিশুর যত বয়োবৃদ্ধি হয় ততই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে। অগ্নিতে দুই একবার তাহার অঙ্গুলি দগ্ধ হইলেই আর সে অগ্নির দিকে অগ্রসর হয় না। অগত্যা তাহাকে কার্য্য-কারণের আধিপত্যে গ্রীবা নত করিতে হয়। কিন্তু মনুষ্য এমন পাত্র নহে যে, সে কার্য্য-কারণের কঠোর আধিপত্য চুপ করিয়া সহ্য করিবে; মনুষ্যের উন্নত গ্রীবা কিছুতেই নত হইবার নহে। মনুষ্য-প্রকৃতি-রূপী দুর্দান্ত অশ্বকে বিজ্ঞান-রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া আপনার অভীষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে। মনুষ্যই বা প্রকৃতিকে জ্ঞানায়ত্ত করে কেন—পশুরাই বা তাহা না করে কেন? সমুদ্র-পোতের কোটর-গর্ব্ভে যাহারা কারাবদ্ধ থাকে, তাহারা সমুদ্রের তরঙ্গ-দ্বারা চালিত হয় অথচ সমুদ্র দেখিতে পায় না, কিন্তু যে ব্যক্তি সমুদ্র-তীরে দণ্ডায়মান থাকে সে ব্যক্তি সমুদ্রের তরঙ্গ দ্বারা অবিচলিত অথচ সমুদ্রকে দিগদিগন্তরে প্রসারিত দেখিতে পায়। পশু পক্ষীরা প্রকৃতির গর্ব্ভে বিলীন আছে, তাই তাহারা প্রকৃতিকে জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারে না,—মনুষ্য প্রকৃতির অতীত প্রদেশে দাঁড়াইয়া আছে তাই সে প্রকৃতিকে জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে সমর্থ। বিজ্ঞান-দ্বারা মনুষ্য জগতের কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা দেখিতে পায়—কিন্তু যে কূলে দাঁড়াইয়া মনুষ্য প্রকৃতির ঐ তরঙ্গ-লীলা অবলোকন করে, সে কূল প্রকৃতির অতীত—বিজ্ঞানের অগম্য; সে কূল বিশুদ্ধ-প্রেমের রাজ্য—বিশুদ্ধ জ্ঞানের গম্য। বিজ্ঞান মনুষ্যের দাস বই নহে—কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেম মনুষ্যের পরম প্রীতিভাজন বন্ধু। যেমন দাস-বর্গের সঙ্গে—তেমনি বিজ্ঞানের সঙ্গে—মনুষ্যের সহেতুক সম্বন্ধ,—আর, যেমন হৃদয়-বন্ধুর সঙ্গে—তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেমের সঙ্গে—মনুষ্যের অহেতুক সম্বন্ধ। দাস কি জন্য? না সেবার জন্য; বিজ্ঞান কি জন্য? না জাহাজ চালাইবার জন্য—ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য—সেতু নির্ম্মাণের জন্য—এক কথায় সেবার জন্য। বিশুদ্ধ-জ্ঞান-প্রেম কি জন্য? এখানে কি-জন্য-জিজ্ঞাসার কোন অর্থ নাই—এখানে জ্ঞান জ্ঞানেরই জন্য—

প্রেম প্রেমেরই জন্য—আর কিছুরই জন্য নহে। বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রেমের উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যের কোন আপাত-প্রয়োজনীয় কার্য্যসিদ্ধি নির্ভর করে না, কিন্তু তাহার উপর অত্যন্ত একটি গুরুতর বিষয় নির্ভর করে—মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে,—তাহারই গুণে মনুষ্য, মনুষ্য হয়, তাহা যাহার নাই সে—মনুষ্যই নহে। পশু-পক্ষীরা প্রকৃতিকে চিনিতে পারে নাই, তাই তাহারা প্রকৃতির রাজ্যে নিরুদ্বেগে বিচরণ করিতেছে—কল্য কি আহার করিবে, অদ্য তাহা ভাবে না। কিন্তু মনুষ্য প্রকৃতিকে বিলক্ষণ চিনিয়াছে—তাই সে প্রকৃতির অধিকারে বাস করিয়া কিছুতেই সন্তোষ লাভ করিতে পারে না,—প্রকৃতির অতীত প্রদেশে আপনার একটা বাস-স্থানের আয়োজন না করিয়া কিছুতেই নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারে না। আমরা প্রকৃতির অতীত প্রদেশের লোক—তাই আমরা প্রকৃতির কঠোর শৃঙ্খলায় প্রপীড়িত হইয়া দিবানিশি ক্রন্দন করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ"—জীব শরীরাভ্যন্তরে নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত অসহায় ও মুহ্যমান হইয়া—শোক করিতে থাকে; "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ," যখন সে আপনার সম্ভজনীয় প্রভুকে এবং তাঁহার মহিমাকে দেখে তখন সে শোক হইতে মুক্ত হয়। আমাদের চিরন্তন মুক্তিদাতা আজ এখানে আমাদিগকে দেখা দিবেন—তাঁহাকে দেখিয়া আমরা বীতশোক হইব—তাই আমরা এই শান্তিমন্দিরে সমাগত হইয়াছি। আত্মার পরম আশ্রয় পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া আমরা নির্ভয়ে বিচরণ করিব—ইহাই আমাদের প্রয়োজন।

হে পরমাত্মন্! আজ তোমার আরাধনার জন্য আমরা এই পবিত্র মন্দিরে সমাগত হইয়াছি—তোমার মৃতসঞ্জীবনী শক্তিতে তুমি আমাদিগকে জীবন দান কর। যাহার আলোকে ভক্ত জনেরা তোমার দর্শন পাইয়া আনন্দ-সাগরে নিলীন হয় আমাদের অভ্যন্তরে সেই চক্ষু ফুটাইয়া দেও; যাহার গুণে দীন-হীন মর্ত্ত্য মানব তোমার মহিমায় মহীয়ান হইয়া অমর পদবী তুচ্ছ করে, সেই প্রেম তুমি আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরে উদ্দীপন কর; আমরা সকলে একাত্মা হইয়া এক মনে তোমার চরণে প্রণিপাত করিতেছি তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ করিয়া আমাদের হৃদয়ের চিরাভিলাষ পূর্ণ কর—তোমার অমোঘ শান্তি-বারিতে আমাদের সমস্ত পাপতাপ প্রক্ষালিত করিয়া আমাদের আত্মাকে তোমার সহবাসের উপযুক্ত কর,—আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি—তোমার বিমল মুখজ্যোতিতে তুমি আমাদের সমস্ত অন্ধকার দূর করিয়া দেও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দর্শন-সংহিতা।

মূলতত্ত্ব-সকল যদিও তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যন্তরে কার্য্য-করে তথাপি তাহারা অলক্ষিত।

এমন-যে শ্রদ্ধেয় শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞান তাহার কেন এরূপ দশা যে, এই অপরাহ্ণ-কালেও সে তাহার মূলতত্ত্ব-সকলের বিশদ ব্যাখ্যায় বঞ্চিত, এখন ইহা—অন্ততঃ কতক পরিমাণে—বুঝিতে পারা যাইবে। ঐ মূলতত্ত্বগুলি মূলস্থিত তাই উহাদের আবিষ্কারে এত বিলম্ব। কিন্তু যদিও তত্ত্বজ্ঞানের কোন রীতিমত শাস্ত্র নাই, তা' বলিয়া আমরা এরূপ মনে করিতে পারি না যে, উহার মূলতত্ত্ব-সকল এ-যাবৎ কাল শক্তিহীন সত্তাহীন এবং সাড়া-শব্দহীন হইয়া চুপ করিয়া পড়িয়াছিল; উল্টা

আরো, জীবন্ত বীজের ন্যায়, উহারা ব্যাস প্রভৃতি করিয়া বড় বড় জ্ঞানীদিগের মনে শাখা-পত্র-ফল-ফুলে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সত্যের ঐ-সব বীজ-ধাতু কোন কালে ঘুমাইয়া ছিল না বটে, কিন্তু এটা ঠিক যে, উহাদের কার্য্য উহারা অতি সংগোপনে এবং নিঃশব্দে সমাধা করিয়া আসিতেছে। আশ্চর্য্য দৃঢ়তার সহিত উহারা দৃষ্টি-পথ অতিক্রম করিয়া কোটরে নিলীন হইয়া যায়; এজন্য, কে-যে উহারা—তাহা কেহই জানে না; উহাদের পরিচয় প্রদান করা তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ক জল্পনার কর্ম্ম নহে, তাহা এমনি একটি যুক্তি-যুক্ত গ্রন্থকে অপেক্ষা করে—যাহা সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান এবং তাহার মূলতত্ত্ব-সকলের ঔপক্রমণিক ব্যাখ্যা-সকল—অল্পই হউক্ আর অধিকই হউক্—কিছু-না-কিছু অসম্পূর্ণ হইবেই। তত্ত্বজ্ঞানের মূল প্রশ্ন-সকলের মধ্যে যে-গুলি অপেক্ষাকৃত গুরুতর, এই উপক্রমণিকার ভিতরেই আর-একটু এগিয়ে তাহাদের আলোচনা এবং বিলি-ব্যবস্থা করা যাইবে। মাঝখানে এই একটি কথা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, তত্ত্বজ্ঞানের বীজ-ধাতু, মূলতত্ত্ব, অথবা প্রারম্ভ-সূত্র বলিতে আমরা প্রধানতঃ বুঝি—উহার এক অনন্য উত্থান-মার্গ, উহার লক্ষ্য বা প্রয়োজন, জগতে উহা কিসের জন্য আসিয়াছে, কি উহাকে করিতে হয়—কেন করিতে হয়—কি প্রকারেই বা তাহা কৃত হয়। এ-সমস্ত বিষয় যদিচ প্রকৃতির পর্য্যায়ে প্রথম, তথাপি জ্ঞানের পর্য্যায়ে চরম। উহারা দর্শন-সোপানের গোড়ার পইটা, তথাপি লোকে অনেক কালের পর অতি কষ্টে তবে উহাদের সন্ধান পাইয়াছে। উহারা তত্ত্ব-জ্ঞানের যুগাদি-সঞ্চিত বীজ—আদিম ভূস্তর, তথাপি এখনো পর্য্যন্ত আলোকে উদ্ধৃত হয় নাই। তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি—প্রয়োজন কি—ইহার একটি প্রগাঢ় তাৎপর্য্য-বোধে পুরা-কালের দার্শনিকদিগের মন পরিব্যাপ্ত ছিল ইহাতে আর সন্দেহ নাই; সকল জ্ঞানের এবং সকল সত্তার মূলতত্ত্ব-গুলির একটা অপরিস্ফুট আবির্ভাব তাঁহাদের মনে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাহা তাঁহাদের চক্ষের সমক্ষে বিজুলি খেলিয়া বেড়াইয়াছিল মাত্র—সুস্পষ্ট আকার-ধারণে সমর্থ হয় নাই। পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন সুন্দর মুখাকৃতির ন্যায় তাহা তাঁহাদের সম্মুখে ধরা না দিয়া, পশ্চাৎ হইতে তাঁহাদিগকে কি যেন এক ঘোরালো অলৌকিক সত্তার সম্ভ্রমে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

এজন্য তত্ত্বজ্ঞান কোথাও আদ্যোপান্ত প্রমাণ করিয়া তোলা দৃষ্ট হয় না।

এ জন্য কোন স্থানেই এরূপ দেখা যায় না যে, তত্ত্বজ্ঞান আদ্যোপান্ত জ্যোতির্ম্ময় বিজ্ঞানের একটি ব্যূহ, অথবা প্রমাণীকৃত সত্যের একটি ব্যাপার। তত্ত্বজ্ঞান আপনার কার্য্য কি তাহাই আগে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করুক, ও কিরূপে সে-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে তাহার উপায় স্থিররূপে অবধারণ করুক, তবে তো সে ওরূপ হইবে। তাহা যতক্ষণ না হইতেছে—যতক্ষণ না সে আপনার মূল-তত্ত্ব-সকল আপনি করায়ত্ত করিতেছে, এবং তাহাতে-করিয়া তাহাদের কার্য্যের প্রসর ও প্রকরণ-পদ্ধতি সমস্তই আপনার চক্ষের সমক্ষে বুদ্ধি-পূর্ব্বক ধরিয়া পাইতেছে, যতক্ষণ সে আপনার মূলতত্ত্ব-সকলের কাছে আপনি নতশির ও হত-জ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ওরূপ অভিজ্ঞতা-লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিবার নহে। মৌলিক সত্য সকল—তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার আদিম প্রবর্ত্তক-সকল—তত্ত্বজ্ঞানের মূর্ত্তি-সংগঠনে তলে তলে সহায়তা করিলেই যে, সব হইল, তাহা নহে। তাহাদের প্রভাব, যাহা এ-যাবৎ কাল ভিতরে

ভিতরে সংগোপনে কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাহা প্রকাশ্যে পরিস্ফুট হওয়া চাই, তাহা হইলেই তত্ত্বজ্ঞান আপনার অস্তিত্বের নিগূঢ় মর্ম্ম বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া, কি কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছে তাহা সম্যক্ অবগত হইয়া, এবং নিখিল বৈজ্ঞানিক দিগ্‌বিজয়ের অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, বাহির হইতে পারে। কিন্তু দার্শনিক আলোচনা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরিয়া অভীষ্ট পথে লাগিয়া না থাকিলে, ওরূপ সুখজনক পরিণামটি ঝটিতি সম্পন্ন হইবার নহে; কারণ, কালে যাহা প্রথম, জ্ঞানে তাহা চরম। এজন্য, এ-যাবৎ কাল তত্ত্বজ্ঞান কেবল এইরূপ-সব মতামতেরই কাণ্ড হইয়া আসিতেছে যাহার কোনটিই গোড়া হইতে প্রমাণ করিয়া তোলা নাই। সে-সকল মতামত দেখিলে মনে হয় বটে যে, তাহাদের অপেক্ষা স্পষ্ট সত্য আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু তথাপি তাহারা বোধগম্য নামের যোগ্য নহে; কেননা, হয় প্রবল যুক্তি-দ্বারা সমর্থিত হউক, নয় জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী সত্য হউক, দুয়ের না এটি—না ও-টি—এরূপ হইলে বিজ্ঞান-মহলে কোন কিছুই বোধগম্য শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

অবশ্যম্ভাবী-সত্যের প্রত্যাখ্যান তত্ত্বজ্ঞানের আর একটি প্রতিহন্তৃ-কারণ।

যুক্তি-হীনতার প্রসঙ্গাধীন তত্ত্বজ্ঞানের যেরূপ অসম্পূর্ণতা প্রদর্শিত হইল, তাহার কারণ-প্রদর্শন-ছলে আরো এই বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন কাল হইতে একটা পরাক্রম-শালী প্রবৃত্তি তত্ত্বজ্ঞানের বৈধ প্রযত্নের প্রতিহন্তা হইয়া আসিতেছে। সে প্রবৃত্তিটা সম্প্রতি কোন-কোন মহলে প্রকট-ভাব ধারণ করিয়া এইরূপ এক প্রতিজ্ঞা-আকারে দেখা দিয়াছে যে, জ্ঞানের নিতান্ত অবশ্যম্ভাবী তত্ত্ব-গুলিকে যতদূর সাধ্য অল্পের মধ্যে সঙ্কুচিত করিতে হইবে,—উহাদিগকে একেবারেই উড়াইয়া দেওয়া না হো'ক—অন্ততঃ উহাদিগকে বিশুদ্ধ গণিতের মধ্যে আটক করিয়া রাখিতে হইবে—তাহার বাহিরে যাইতে দেওয়া হইবে না। প্রশ্নটি অতি সরস; কিন্তু যেমন আর আর প্রশ্নের সম্বন্ধে তেমনি ইহারও সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, কতকগুলি সাধারণ মন্তব্যের বলে উহার সমুচিত মীমাংসা হইতে পারে না,—উহার রীতিমত মীমাংসা করিতে হইলে বিবাদের সামগ্রী-গুলিকে (অর্থাৎ স্বয়ং অবশ্যম্ভাবী সত্য-গুলিকে) সাক্ষাতে আনিয়া উপস্থিত করা চাই। এ-গুলি পরে যথাস্থানে আসিবে। মাঝ পথে, তাহাদের সপক্ষে বাহুল্য বাদানুবাদ অথবা তাহাদের সবিস্তর পরিচয়-প্রদর্শন, পরিহর্ত্তব্য; কেননা, এখন কেবল দার্শনিক আলোচনার গতি-রোধক কারণ-গুলি দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য; কেবল, জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী সত্য-সকলের প্রতি হত-শ্রদ্ধা নাকি ঐ কারণ-গুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দলভুক্ত, এই জন্যই এখানে তাহাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা।

অবশ্যম্ভাবী সত্য কাহাকে বলে।

যাহা হউক, অবশ্যম্ভাবী সত্য কাহাকে বলে তাহার ব্যাখ্যা উপলক্ষে দুই একটি মন্তব্য এখানে প্রকাশ করিতে হানি নাই। তাহাকেই আমরা বলি জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী সত্য বা অবশ্যম্ভাবী নিয়ম, যাহার বিরোধী পক্ষ অভাবনীয়, স্ববিরোধী বা আত্মহন্তা, অর্থ-শূন্য, অসম্ভব; আরো সংক্ষেপে, সেই সত্যই অবশ্যম্ভাবী যাহার সংস্থাপন-কার্য্যে প্রকৃতির গত্যন্তর ছিল না। প্রকৃতি এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিলেও করিতে পারিত যে, পৃথিবী সূর্য্যকে নহে কিন্তু সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবে, অন্ততঃ এরূপ কল্পনাতে

স্ববিরোধী কিছুই লক্ষিত হয় না। দুই পক্ষই সমান সম্ভবায়ত্ত ছিল। কিন্তু প্রকৃতি কোন অবস্থাতেই নিম্নলিখিত এ নিয়মটি সংস্থাপন করিতে পারিত না যে, কোন একটি স্থান দুইটি-মাত্র সরল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে; কেননা, সরল রেখা-দ্বয় যদি কোন একটি স্থানকে পরিবেষ্টন করে, তবে তাহাতে কেবল ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, উভয়ের—হয় একটি—নয় দুইটিই—বক্র-রেখা; এইরূপে, অবশ্যম্ভাবী সত্যের বিরোধী পক্ষ আপনিই আপনাকে খণ্ডন করে।

প্রতিপক্ষের স্ব-বিঘাত অবশ্যম্ভাবী সত্যের নিদর্শন-চিহ্ন।

তত্ত্ব সিদ্ধির এই-যে একটি নিয়ম যে, তত্ত্ব সপক্ষের সংস্থাপক এবং প্রতিপক্ষের প্রতিষেধক, * ইহাই অবশ্যম্ভাবী সত্যের নিদর্শন-চিহ্ন। এ নিয়মটিকে সচরাচর যেরূপ অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে, উহাকে তাহার আর-এক ধাপ উপরে লইয়া গিয়া আরো ভাল করিয়া প্রদর্শন করা যাইতে পারে। নিয়মটি এই যে, যে যাহা—সে তাহাই হইবে। ক যে—সে ক। যিনি অবশ্যম্ভাবী সত্যের অস্তিত্ব সমূলে অস্বীকার করেন—সুতরাং ক যে, ক, ইহা মানিতে চা'ন না, মনে কর তিনি বলিতেছেন "না তাহা নহে, যে যাহা—সে তাহা না হইতেও পারে," ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তবে তোমার ঐ যে কথা যে, "যে যাহা—সে তাহা না হইতেও পারে" ঐকথাটি যাহা—উহা তাহা না হউক্, তোমার কথাটি একেবারেই উল্‌টিয়া যা'ক্; তাহা হইলে দাঁড়াইবে যে, তোমার কথার মূলার্থ এবং ফলিতার্থ উভয়ে পরস্পরের বিপরীত; সুতরাং উভয়ের একটিকে গ্রহণ করিতে গেলে আর-একটিকে পরিত্যাগ করিতে হয়। কোন্‌টিকে গ্রহণ করিব? তোমার কথার অর্থ প্রথমে ছিল, "যে যাহা—সে তাহা না হইতেও পারে" এখন তাহা উল্টাইয়া গিয়া এই দাঁড়াইতেছে "যে যাহা—সে তাহা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না" এই দুই বিপরীত অর্থের মধ্যে তুমি আমাকে একটি ছাড়িয়া আর একটি গ্রহণ করিতে বলিতেছ—তোমার অভিপ্রেত প্রথম অর্থটিই গ্রহণ করিতে বলিতেছ। কিন্তু সেইটিই যে ঠিক্ অর্থ তাহার প্রমাণ কি? যে যাহা সে-যদি তাহা না হইতেও পারে, তবে তোমার কথা যাহা—সে যে তাহাই—তাহার প্রমাণ কি? তাহার একটা প্রমাণ আমাকে দেখাও—নহিলে আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি না।" মানুষটি চুপ। তিনি প্রমাণ দর্শাইতে পারেন না। যখনই তিনি তাঁহার ঐ কথাটি তোলেন, তখনই তিনি বিনা-প্রমাণে অগত্যা মানিয়া ল'ন যে, ও কথা যাহা—উহা তাহাই। এইটিই আমরা চাই। তত্ত্ব-সিদ্ধির নিয়ম আপনিই আপনাকে প্রতিপন্ন করিতেছে। উহা অস্বীকৃত হইলেও স্বীকৃত হয়; কারণ, যিনি অস্বীকার করেন তাঁহাকে ইহা মানিতেই হয় যে, তিনি অস্বীকার করিতেছেন, অথবা যাহা একই কথা—তাঁহাকে মানিতেই হয় যে, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহাই বলিতেছেন এবং তাহার সঙ্গে ইহাও মানিতে হয় যে, তাহার প্রতিপক্ষ বচন (অর্থাৎ তিনি

* ন্যায়-শাস্ত্রে তত্ত্বের এইরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে,—সৎ সদিতি গৃহ্যমানং যথাভূতং অবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি; অসৎ চ অসদিতি গৃহ্যমানং যথাভূতং অবিপরীতং তত্ত্বম্ভবতি। সৎকে সৎ বলিয়া গ্রহণ করা হইলে, তাহা তত্ত্ব-শব্দের বাচ্য হয়; আর, অসৎকে অসৎ বলিয়া গ্রহণ করা হইলে, তাহা তত্ত্ব-শব্দের বাচ্য হয়। তত্ত্ব সপক্ষের সংস্থাপক এ নিয়মটিকে ইংরাজীতে বলে Law of identity। Identity (ইদত্ত্ব) এবং তত্ত্ব বলে একই। তত্ত্ব প্রতিপক্ষের নিষেধক—এ নিয়মটিকে বলে Law of contradiction এই নিয়মানুসারে সৎকে অসৎ বলা কিম্বা অসৎকে সৎ বলা স্ববিরোধী, এক কথায় তত্ত্বের বিপর্য্যয় স্ববিরোধী।

যাহা বলিতেছেন তাহা বলিতেছেন না—এই কথাটি) আপনিই আপনার হন্তা। ইহাতে আর কিছু না হোক্—জ্ঞানের (একটি অন্ততঃ) অবশ্যম্ভাবী সত্য আছে, ইহা স্থির হইল; যদি একটি থাকিতে পারে, তবে অনেকগুলি থাকিতেই বা না পারিবে কেন? ফলে, প্রতিপক্ষ-ব্যাহতির নিয়মটিকে স্বতন্ত্র একটি অবশ্যম্ভাবী নিয়ম না বলিয়া এই বলিলে আরো ঠিক্ হয় যে, যে সব সত্যের বিপরীত পক্ষ স্ববিঘাত-গর্ভ, সমস্তেরই উহা সাধারণ ধর্ম্ম এবং অভিজ্ঞান-লক্ষণ। ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রতিপক্ষ-ব্যাহতির ঐ যে নিয়ম (কি না, যে যাহা—সে তাহার বিপরীত হইতে পারে না) উহার নিজের কোন গুণ নাই। শুদ্ধ কেবল উহার নিজের প্রতি দৃষ্টি করিলে উহা অকিঞ্চিৎকর হইতেও অকিঞ্চিৎকর। উহা সমুদায় অবশ্যম্ভাবী সত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-লক্ষণ বলিয়াই উহা যাহা কিছু কাজে লাগে। অবশ্যম্ভাবী সত্যের পরীক্ষা এই যে, তাহার প্রতিপক্ষ স্ববিঘাত-গর্ভ কি না? তাহা যদি হয় তবে তাহা যথার্থই অবশ্যম্ভাবী; তাহা যদি না হয়, অর্থাৎ তাহার বিপরীত পক্ষ যদি স্ববিরোধী না হয়, তবে তাহা অবশ্যম্ভাবী নহে—তাহা আগন্তুক মাত্র।

প্রত্যাবর্ত্তন।

এ-সব ব্যাখ্যা-কার্য্যে এখন ক্ষান্ত হইয়া, যে-বিষয়টি সাক্ষাৎ আমাদের হস্তে আছে, কিনা তত্ত্বজ্ঞানের গতি-হন্তা কারণের অনুসন্ধান, তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন করা যা'ক। এই-যে এক অমূলক উপন্যাস বিনা-প্রমাণে মানিয়া লওয়া হয় যে, যাহাকে অবশ্যম্ভাবী সত্য অথবা জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম বলা যায়—হয় তাহা কোন কার্য্যেরই নহে—নয় তাহার সংখ্যা এত অল্প যে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে, আর, ধৃষ্টতায় ভর করিয়া এই-যে এক মিথ্যা-অপবাদ ঘোষণা করা হয় যে, ও-সব সত্যের অনুসন্ধান অবৈধ চর্চ্চা, এ যেমন তত্ত্বজ্ঞানের উন্নতির সাক্ষাৎ প্রতিহন্তা ও তত্ত্বজ্ঞানকে যুক্তি-হীন কিম্ভূত এক-প্রকার বিজ্ঞান করিয়া তুলিবার কর্ত্তা, এমন আর কিছুই নহে। কারণ, অবশ্যম্ভাবী সত্যের অনুশীলন ছাড়িয়া দিলে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত কার্য্য যাহা—তাহাই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তত্ত্বজ্ঞানের গতি-রোধক কারণ এ-খানে এই যাহা দেখানো হইতেছে, ইহা পূর্ব্ব-কথিত মূল কারণটির একটি অবান্তর শাখা মাত্র; মূল-কারণ সে এই যে, কার্য্যের বেলায় যাহা প্রথম, জ্ঞানের বেলায় তাহা চরম। জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী সত্য-সকল নাকি তত্ত্বজ্ঞানের বীজ-ধাতু, কার্য্যের বেলায় নাকি উহারা সকলের অগ্রবর্ত্তী, তাই এইটি ঘটিয়াছে যে, জ্ঞানের বেলায় উহারা সকলের পশ্চাৎবর্ত্তী; দৃষ্টি এড়াইয়া লুকাইয়া থাকিতে উহারা সর্ব্বাপেক্ষা দড়ো, আর আলোকে বাহির হইবার সময় উহারা সকলের শেষে বাহির হয়। এ ছাড়া, আর একটি উপরি-রকমের প্রতিবন্ধক যাহার কথা কিয়ৎপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার বিরুদ্ধেও উহাদিগকে যুঝিতে হইয়াছে,—সেটি আর কিছু না—তাহারা যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে সেইদিকে সকলের প্রাণ-পণ চেষ্টা। কিন্তু চরমে উহারা তারকা মালার ন্যায় উজ্জ্বল প্রভায় দীপ্যমান হইয়া উঠিবে, আর, তারকা-মালারই ন্যায় হয় তো বা অসংখ্য দৃষ্ট হইবে।

জর্ম্মানি এবং ইংলণ্ডে তত্ত্বজ্ঞানের দুরবস্থা।

তত্ত্বজ্ঞানের অচলিষ্ণু বিশৃঙ্খল এবং দুরায়ত্ত অবস্থার সংক্ষেপে এই-যে কারণ দর্শানো হইল, ইহার উপসংহার-চ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, কি ইংলণ্ড, কি জর্ম্মানি, উভয় প্রদেশেই—অবশ্যম্ভাবী সত্য-সকল

যদিচ স্থল-বিশেষে এবং তাৎপর্য্য-বিশেষে স্বীকৃত হইয়া থাকে তথাপি—তাহাদের দশা যতদূর মন্দ হইতে পারে তাহা হইয়াছে। তাহাদের মধ্য-হইতে এক টি দল বাছিয়া লইয়া তাহাদের উপরেই কেবল পূর্ব্ব-প্রদর্শিত প্রতিপক্ষ-বিঘাতের পরীক্ষা (অর্থাৎ তাহাদের বিপরীত পক্ষ স্ববিঘাত-গর্ত্ত কি না তাহার পরীক্ষা) প্রয়োগ করানো হইয়াছে, অবশিষ্টগুলি সে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ অথচ তাহাদিগকেও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ধরা হইয়াছে—আগন্তুকের কোটায় তাহাদিগকে স্থান দিলে কি-যেন অনুচিত কার্য্য করা হইত। অবশ্যম্ভাবী সত্য-মাত্রকেই প্রতিপক্ষ-বিঘাতের পরীক্ষা উদ্‌যাপন করা চাই, তাহাতে যাহারা পিছপাও তাহারা অবশ্যম্ভাবী নামের অযোগ্য। পরীক্ষা-প্রয়োগের এই যে, বিশৃঙ্খলা বা শৈথিল্য, এটি কাণ্টের কাজ; ইহার ফল হইয়াছে—ঘোরতর গোলোযোগ। ইংলণ্ডের তত্ত্ববিদগণ কাণ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন এবং কতক পরিমাণে তাহার পথও দেখাইয়াছেন। অবশ্যম্ভাবী সত্যের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া অবধি ইংলণ্ডের পণ্ডিতগণ এরূপ অবিচক্ষণতা সহকারে তাহাদের লইয়া তোলা-পাড়া করিয়াছেন, আগন্তুক সত্য-সকলের সহিত তাহাদিগকে মিশাইয়া এরূপ জড়িঘাণ্ট পাকাইয়াছেন, দুই শ্রেণীর সত্যের মধ্যে প্রভেদ যাহা আছে তাহা একেবারেই ভণ্ডুল করিয়া উভয়কে অনেকাংশে এরূপ অবিকল সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন যে, অবশ্যম্ভাবী সত্যের প্রতি তাঁহারা আদবেই যদি হস্তক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানের ভাবী মঙ্গলের পথ এখনকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিষ্কণ্টক হইত।*

তত্ত্বজ্ঞানের অসন্তোষ-জনক অবস্থার কিসে প্রতীকার হয়।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা এই, কেমন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের বর্ত্তমান অসন্তোষ-জনক অবস্থার

---

* যাহা বলা হইল তাহার পোষকতায় পাঠককে আমরা কাণ্টের সেই জটিল এবং বিভ্রান্তি-জনক স্থানটি দেখিতে অনুরোধ করি যেখানে তিনি সিদ্ধান্ত-সকলকে যৌগিক (Synthetical) এবং রূঢ়িক (Analytical) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উভয়ের প্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

কাণ্টের মতে এরূপ এক শ্রেণীর সিদ্ধান্ত আছে যাহার বিশেষণ-পদের অর্থ পূর্ব্ব হইতেই তাহার বিশেষ্য-পদে অন্তর্ভূত রহিয়াছে; যেমন এই একটি সিদ্ধান্ত যে, পিণ্ড-মাত্রই বিস্তারবান্। এখানে বিস্তার-বত্তা লক্ষণটি পূর্ব্ব-হইতেই পিণ্ডে অন্তর্ভূত রহিয়াছে; কারণ, যাহাকে বলে বিস্তৃত পদার্থ তাহাকেই বলে পিণ্ড; "পিণ্ড" এই শব্দের উল্লেখ মাত্রেই বুঝায় যে, তাহা বিস্তার-বান্; সুতরাং পিণ্ডকে বিস্তারবান্ বলা বাড়ার ভাগ—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মাত্র। এইরূপ যত সিদ্ধান্ত—যাহা নূতন কিছুই বলে না, বিশেষ্য-পদ যাহা বলিয়া চুকিয়াছে—বিশেষণকে দিয়া তাহাই পুনরুক্তি করায় মাত্র, কাণ্ট্ ইহাদের নাম দিয়াছেন—রূঢ়িক সিদ্ধান্ত। এই শ্রেণীর যাবতীয় সিদ্ধান্তই অবশ্যম্ভাবী সত্যের লক্ষণাক্রান্ত; এবং প্রতিপক্ষের স্ববিরোধিতাই ইহাদের নিদর্শন-চিহ্ন; কারণ, একবার যখন পিণ্ডের সঙ্গে বিস্তারবত্তা লক্ষণ জড়িত করা হইয়াছে, তখন "পিণ্ড বিস্তারবান্ নহে" বলাও যা, আর, পিণ্ড পিণ্ড নহে বলাও তা'—উভয়ই সমান।

আর-এক শ্রেণীর সিদ্ধান্ত আছে যাহাকে কাণ্ট্ যৌগিক নামে নির্দ্দেশ করেন। যৌগিক সিদ্ধান্তের বিশেষণ-পদের অর্থ পূর্ব্ব হইতেই তাহার বিশেষ্য-পদের অন্তর্ভূত নহে; এই জন্য এরূপ সিদ্ধান্ত কখনো কখনো বৈবর্দ্ধিক বলিয়া উক্ত হয়; বৈবর্দ্ধিক—অর্থাৎ যাহা জ্ঞানেতে নূতন সামগ্রী যোগাইয়া জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন করে। কাণ্টের মতে সিদ্ধান্ত-সকল, আবার, আর-দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—(১) আগন্তুক এবং (২) অবশ্যম্ভাবী। "স্বর্ণ দ্রব-সাধ্য" এ সিদ্ধান্তটি আগন্তুক; কেননা, দ্রব-সাধ্যতা লক্ষণ বাদ দিয়াও স্বর্ণকে ভাবা যাইতে পারে। "স্বর্ণ বিস্তারবান্" এ সিদ্ধান্তটি অবশ্যম্ভাবী; কেন না, বিস্তৃতি-লক্ষণ বাদ দিয়া স্বর্ণ ভাবিতে পারা যায় না।

এ পর্য্যন্ত প্রভেদ-টি বুঝিতে কোন কষ্ট নাই। রূঢ়িক সিদ্ধান্ত মাত্রই অবশ্যম্ভাবী, আর, আগন্তুক সিদ্ধান্ত-মাত্রই যৌগিক, এটুকু পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। কিন্তু যৌগিক অথচ অবশ্যম্ভাবী, এইরূপ এক কিম্ভূত-শ্রেণীর সিদ্ধান্তের কথা কাণ্ট যখনই বলিতে সুরু করিয়াছেন, তখনই গোলোযোগ বাধাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ঐরূপ সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী সত্যের (অন্ততঃ মনুষ্য-বুদ্ধি-সুলভ অবশ্যম্ভাবী সত্যের) লক্ষণাক্রান্ত, অথচ প্রতিপক্ষের স্ববিরোধিতা উহাদের নিদর্শন-চিহ্ন নহে। তবেই হইল যে, এ-সকল সিদ্ধান্তের বিশেষণ-পদের অর্থ কোন গতিকেই উহাদের বিশেষ্য পদের অন্তর্ভূত নহে।

প্রতীকার সাধিত হইবে? সংক্ষেপে ইহার উত্তর এই যে, রীতিমত পরিশ্রম-সহকারে এমন একটি তত্ত্বজ্ঞানের তন্ত্র † পরিপাটী রূপে গুছাইয়া তুলিতে চেষ্টা করা হো'ক, যাহা এক দিকে যেমন সত্য হইবে, আর এক দিকে তেমনি যুক্তিযুক্ত হইবে—শিথিল রূপে নহে কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে; এ ভিন্ন উহার আর-কোন উপায় নাই। "অভি-প্রায় ভাল" এ বলিয়া দোষের প্রতি দয়া করা হইবে না; মনুষ্য-জ্ঞানের দুর্ব্বলতার ছুতা গ্রাহ্য করা হইবে না (কারণ, সে দুর্ব্ব-লতা আর কিছুই না—কেবল দৈন্য-গুণের ভান-কারী আলস্য মাত্র); ব্যাপারটি অতি কঠিন বলিয়া কোন-প্রকার নিষ্কৃতি—চাওয়াও হইবে না—দেওয়াও হইবে না। কার্য্যটি হয় রীতি মত করা হো'ক—না হয় তো আদ-বেই না করা হো'ক। প্রস্তাবিত গ্রন্থটি তত্ত্বজ্ঞানের দেহ-পোষক কোন খণ্ড-প্রবন্ধ হইলে চলিবে না। আমি তো কাট খড় প্রভৃতি উপকরণের আয়োজন করিয়া নি-শ্চিন্ত—প্রতিমা যে গড়িবার সে গড়িবে—এরূপ করিলে চলিবে না। বিজ্ঞানের উপকরণ-সংগ্রাহকদিগের অনেকে আপনা-দের পরিশ্রমের প্রতি ঐরূপ সদয়-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে কেমন তৎপর। বিনয়ী লোক সব। একজন রাজ-মজুর—যে বলে "এই নি'ন মহাশয় ইঁট-কাট—এখন আপনার বাড়ি আপনিই তৈয়ারি করিতে পারেন" তাহাকে যেন ধন্যবাদ না দিলেই নয়। প্রস্তাবিত গ্রন্থ তত্ত্বজ্ঞানের সার-কথা-গুলির একটিকেও ছাড়িবে না, প্রত্যুত সমস্ত-গুলিকে সম্যক্‌রূপে আত্মসাৎ করিয়া এবং সুদৃঢ় যুক্তি-সূত্রে অনুস্যূত করিয়া তাহাদের লইয়া একটা পরিপাটী-শৃঙ্খলা-বিশিষ্ট সমগ্র-কাণ্ড দাঁড় করাইবে। বিশাল তত্ত্বজ্ঞান বৃক্ষের যে-যে মূল-গ্রন্থি হইতে যে-যে মত-শাখা প্রসারিত হইয়াছে, উহা সেই সেই স্থান ঠিকঠাক দেখাইবে। বিবাদীরা নিজে—সে-সব স্থান কোথায়—তাহা জানে না। প্র-

---

তিনি বলেন যে, জ্যামিতি এবং পাটীগণিতের সমস্ত মূলতত্ত্বই অবশ্যম্ভাবী যৌগিক সিদ্ধান্ত; প্রতিপক্ষের স্ব-বিরোধিতা ইহাদের পরিচায়ক নহে। তাঁহার প্রধান দৃষ্টান্ত "সাত আর পাঁচে বারো হয়" এই সিদ্ধান্তটি। কাণ্ট্‌ বলেন যে, প্রতিপক্ষের স্ববিঘাত ইহাতে অন্তর্ভূত নাই। কিন্তু আমাদের চক্ষে আমরা স্পষ্টই দেখি-তেছি যে, উহার প্রতিপক্ষ স্ববিঘাত-গর্ভ, সুতরাং উহা রূঢ়িক সিদ্ধান্ত; কারণ, যদি বলা যায় যে, "সাত আর পাঁচ বারো নহে" তাহা হইলে প্রকারা-ন্তরে ইহাই বলা হয় যে, "সাত আর পাঁচ—সাত আর পাঁচ নহে," শেষোক্ত প্রতিপক্ষ বচনের বিশেষণ-পদ উহার বিশেষ্য-পদের অর্থ উল্টাইয়া দিতেছে; সুতরাং "সাত আর পাঁচ বারো" ইহার বিশেষণ পদের অর্থ উহার বিশেষ্য পদের অন্তর্ভূত,—বারো এ শব্দের অর্থ সাত-আর-পাঁচের অন্তর্ভূত; অতএব এ সিদ্ধান্তটি যৌগিক নহে কিন্তু রূঢ়িক।

আসল কথা এই যে, অবশ্যম্ভাবী সত্যের লক্ষণা-ক্রান্ত সিদ্ধান্ত মাত্রই রূঢ়িক; ইহাদের মধ্যেকার অনে-কগুলি সিদ্ধান্ত আবার বৈবর্দ্ধিক। উহাদিগকে বৈব-র্দ্ধিক বলিবার কারণ এই যে, যখন বিশেষণ-পদের অর্থ বিশেষ্য-পদের ভিতর এত-দূর নিগূঢ় রূপে প্রচ্ছন্ন থাকে যে, তাহা সহজে বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না, তখন তাহার স্পষ্ট নির্ব্বাচন-কার্য্য আমাদের জ্ঞানে একটা নূতন আবি-ষ্কার সংক্রামিত করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া তোলে। গৃহ-পতির অজ্ঞাতসারে যে ধন গৃহাভ্যন্তরে মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত আছে, তাহা তো তাঁহারই ধন; তাহা আবি-ষ্কার করিয়া পাইলে পূর্ব্বে যাহা তাঁহার ছিল—তাহাই তাঁহার থাকে; অথচ তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ ধন-বৃদ্ধি হয়; এমনি-ধারা, যে সত্য পূর্ব্ব হইতেই আমাদের কাছে আছে কিন্তু নিগূঢ় রূপে প্রচ্ছন্ন, তাহার আবি-ষ্কারেও আমাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়। স্থল-বিশেষে বিশে-ষণ-পদের অর্থ বিশেষ্য-পদের ভিতর নিগূঢ়-রূপে প্রচ্ছন্ন থাকাতেই কাণ্টের মনে এইরূপ ভ্রম জন্মিয়াছিল যে, প্রতিপক্ষের স্ব-বিরোধিতা যৌগিক অবশ্যম্ভাবী সত্যের পরিচায়ক নহে। কাণ্ট্‌ তাঁহার নৈয়ায়িক পদার্থ-সক-লের উপসংহার-স্থলে যে-সকল তত্ত্বকে যৌগিক অব-শ্যম্ভাবী সত্য বলিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন, এখানকার এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে তাহার সম্বন্ধে কেবল এই পর্য্যন্ত ইঙ্গিত করা যাইতে পারে যে, হয় তাহা জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী সত্য নহে—নয় প্রতিপক্ষের স্ববিরোধিতাই তাহার নিদর্শন-চিহ্ন।

† তন্ত্র-শব্দে নানা অর্থ বুঝায়, কিন্তু উহার মুখ্য অর্থ যাহা ন্যায়-শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা এই;— তন্ত্র মিতরেতরাভিসম্বদ্ধস্য অর্থ-সমূহস্য উপদেশঃ, ইহার অর্থ এই যে, পরস্পর-সম্বদ্ধ (অর্থাৎ রীতিমত প্রণালী-বদ্ধ) বিষয়-সমূহের উপদেশ; ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ System।

স্তাবিত গ্রন্থের ব্যাখ্যাতব্য বিষয়-সম্বন্ধে—এক চাই যে, গ্রন্থখানি তত্ত্বজ্ঞানের একটি সমগ্র ইতিবৃত্ত হইবে, আর চাই যে, উহা তত্ত্বজ্ঞানের একটি সমগ্র তন্ত্র হইবে। আর কিছু না হো'ক, অন্ততঃ এটি স্থির যে, তত্ত্বজ্ঞানের হীনাবস্থা সংশোধন-পূর্ব্বক তাহাকে ভাল অবস্থায় আনিতে হইলে এমন একটি গ্রন্থ আবশ্যক, যাহা গোড়ায়-কথিত দুইটি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা (অর্থাৎ সত্য হইবার এবং যুক্তিযুক্ত হইবার প্রয়োজনীয়তা) আগাগোড়া মানিয়া চলিবে।

সত্য এবং যুক্তি উভয়াত্মক একটি প্রতীকার-তন্ত্র অসম্ভব নহে।

জিজ্ঞাসু-ব্যক্তি যদি স্থির-চিত্তে এবং শুদ্ধান্তঃকরণে জ্ঞানের হিত-সাধনে যত্ন নিয়োগ করেন, তবে সত্য আপনার কাজ আপনিই করিবে—সে জন্য কোন চিন্তা নাই। সত্যাভাস, অর্থাৎ লৌকিক-চিন্তা-সুলভ সত্যের ভান, যদিচ নিতান্তই জ্ঞানের বিরোধী, তথাপি জ্ঞানের সহিত সত্যের এমনি এক স্বভাবসিদ্ধ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যদি আপনার লক্ষ্য আপনি যথার্থরূপে জ্ঞানায়ত্ত করে,এবং সে লক্ষ্যের সাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়,তাহা হইলে শুদ্ধ কেবল ঐ স্বভাবসিদ্ধ সম্পর্কের টানে পড়িয়া জ্ঞানের সহিত সত্য সংসক্ত হইয়া যায়। জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক-সূত্রেই সত্য আমাদের প্রাপ্তি-গম্য; আর, মনুষ্যের জ্ঞান যখন আছে, তখন অবশ্য সেই জ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহারও তাহার সাধ্যায়ত্ত। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের বিরুদ্ধে এ কথার কোন বলই খাটে না যে, জ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহার মনুষ্যের সাধ্যাতীত, অথবা সত্যের সহিত জ্ঞানের সামঞ্জস্য এবং তাদাত্ম্য সংঘটন মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব।

জ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহারের একটি মাত্র অনুষ্ঠান-বিধি।

কিন্তু, জ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহার এইটিই হ'চ্চে কথা। অনেকেই মনে ভাবিবেন এইটিই কঠিন। এই এক-রত্তি জীর্ণাবশিষ্ট বিষয়ের সম্বন্ধে কত না দুরূহ বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আজ পর্য্যন্ত কাহারো এক তিল জ্ঞান-বৃদ্ধি হইল না। যুক্তি-যুক্ত তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে নিম্ন-লিখিত একটি মাত্র অনুষ্ঠান-বিধি যথেষ্ট কার্য্য-দর্শী। সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান বিধি এই;—কিছুই স্বীকার করিবে না—জ্ঞান যদি-না তাহাকে অবশ্যম্ভাবী সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করে; অবশ্যম্ভাবী সত্য, অর্থাৎ যাহার প্রতিপক্ষ-কল্পনা স্ববিঘাত-সূচক; আর, কিছুই অস্বীকার করিবে না—যদি তাহা স্ববিঘাত-সূচক না হয়, অথবা যাহা একই কথা —জ্ঞানের কোন-একটি অবশ্যম্ভাবী সত্যের বা অবশ্যম্ভাবী নিয়মের বিরোধী না হয়। এই অনুষ্ঠান-বিধিটি দৃঢ়রূপে পালিত হউক, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানের সমস্ত কার্য্য কুশলে নির্ব্বাহিত হইবে। এই বিধিটির গুরুত্ব—বচনে নহে—কিন্তু সাধনে।

বর্ত্তমান সংহিতা-তন্ত্র সত্যবত্তা এবং যুক্তিমত্তা দুয়েতেই আপনাকে স্বত্ববান্ মনে করে কিন্তু বেশীর ভাগ যুক্তিমত্তাকে।

উপস্থিত দর্শন-সংহিতা, যাহা উপরি-উক্ত সাধারণ মন্তব্য-গুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে আয়াস পাইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ভূমিকাচ্ছলে পূর্ব্বাহ্নে এইটি বলিয়া রাখা ভাল যে, যদিও এ তন্ত্র-টি—সত্যবত্তা এবং যুক্তিমত্তা—দুয়ের কোনটিতেই আপনার স্বত্ব অস্বীকার করিতে পারে না (যদি করে তবে সেরূপ মিথ্যা-বিনয় কাহারো শ্রদ্ধা-ভাজন হইবে না) তথাপি, সত্যবত্তার উপর তত নয়— যত যুক্তি-মত্তার উপর উহা আপনার স্বত্ব

সংস্থাপন করিতে অভিলাষী। যদি অন্যান্য তন্ত্র অপেক্ষা উহা সত্য হয়, তবে যুক্তির গুণেই উহা তাহাদের অপেক্ষা সত্য; আর, অন্যান্য তন্ত্র যদি উহা-অপেক্ষা অসত্য হয়, তবে যুক্তির দোষেই তাহারা উহা-অপেক্ষা অসত্য। যদি যুক্তি-অংশটি গণনা হইতে বহিষ্কৃত করা যায়, তবে অনেক তন্ত্র বর্ত্তমান তন্ত্র অপেক্ষা ঢের বেশী সত্য বলিয়া প্রকাশ পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

বর্ত্তমান তন্ত্র অবশ্যম্ভাবী সত্যের একটি সন্দর্ভ।

এই তন্ত্রটির সাধারণ পরিচয়-লক্ষণ এই যে, ইহা অবশ্যম্ভাবী সত্যের একটি সন্দর্ভ। ইহা একটি-মাত্র তত্ত্ব হইতে বিনিঃসৃত; আর, সে তত্ত্বটি যে, জ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ মূল-তত্ত্ব, ইহা বুঝিতে পারা কঠিন নহে; কারণ, সে তত্ত্বটি অস্বীকার করিলেই স্বব্যাহতি-দোষে জড়াইয়া পড়িতে হয়। ঐ মূলতত্ত্বটি দেখিবা-মাত্র স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান না হইতে পারে কিন্তু তাহাতে কিছুই আইসে যায় না, কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সদ্য-প্রতীতি অবশ্যম্ভাবী সত্যের নিদর্শন-চিহ্ন নহে। স্বল্প-মাত্র চিন্তা-প্রয়োগ এবং তাহার সঙ্গে স্বপক্ষ-প্রতিপাদক মন্তব্য-গুলির প্রতি প্রণিধান—এই যা কেবল আবশ্যক—ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ঐ মূলতত্ত্বটি যথার্থই স্বতঃসিদ্ধ। ঐ-এক মূলতত্ত্ব হইতে সমস্ত তন্ত্রটি ধারাবাহিক সিদ্ধান্ত-পরম্পরা-ক্রমে ব্যাকলিত হইয়াছে; সে সিদ্ধান্তগুলির কোনটিই, দৃঢ় প্রমাণ-বত্তায়, জ্যামিতির কোনো সিদ্ধান্ত অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন নহে; আর, সমস্তগুলি একত্রে মিলিয়া বৃহদাকার একটি-মাত্র অকাট্য সিদ্ধান্তে পর্য্যবসিত। অকাট্য প্রমাণের পরাকাষ্ঠা-চিহ্ন যদি ঐ সিদ্ধান্ত-গুলির গাত্রে অঙ্কিত না থাকে; যদি প্রস্তাবিত তন্ত্রের এক স্থানেও একটি ছিদ্র থাকে; যদি উহার কোন-একটি অধিকরণ-সিদ্ধান্ত* অথবা পরিণাম-সিদ্ধান্ত—দুই আর দুয়ে চার যেমন সুনিশ্চিত—সেরূপ সুনিশ্চিত না হয়; তবে সমস্ত ব্যাপারটা-ই মাটি,—তাহা হইলে তাহার আশা সমূলে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। "তন্ত্রটি আগা গোড়া অকাট্য প্রমাণে প্রমাণীকৃত" এই কথাটির উপরে আমরা আমাদের সমস্তই সংশয়িত করিতেছি; এ কথাটির যদি অণু-মাত্রও ব্যত্যয় ঘটে তবে আমাদের সমস্তই জল-মগ্ন হইয়া যাইবে, যা'ক্ তাহাতে ক্ষতি নাই; কেননা তত্ত্বজ্ঞান যদি আপনার ন্যায্য অধিকার সমর্থন করিতে না পারে, তবে তাহার থাকিয়া কোন প্রয়োজন নাই।

ক্রমশঃ।

আধ্যাত্মিক রূপক।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সাধারণ সমাজের সহিত বাহ্য সম্পর্ক

---

* অধিকরণ সিদ্ধান্ত—অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে Premise। গৌতমের একটি সূত্র এই "যৎসিদ্ধৌ অন্য-প্রকরণ-সিদ্ধিঃ সোঽধিকরণ সিদ্ধান্তঃ" যাহা সিদ্ধ হইলে অন্য প্রকরণ সিদ্ধ হয় তাহাই অধিকরণ সিদ্ধান্ত। ঐ সূত্রটির ভাষ্যে উহার যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা এই "যস্য অর্থস্য সিদ্ধৌ অন্যে অর্থা অনুষজ্যন্তে, ন তৈর্বিনা সোঽর্থঃ সিদ্ধ্যতি, তেঽর্থা যদধিষ্ঠানাঃ, সোঽধিকরণসিদ্ধান্তঃ" ইহার অর্থ এই, যে বিষয়-টি সিদ্ধ হইলে অন্যান্য বিষয় সিদ্ধ হয়, এবং যাহা ব্যতিরেকে তাহারা সিদ্ধ হয় না, যাহাতে তাহারা অধিষ্ঠান করিয়া আছে, অর্থাৎ ভর করিয়া আছে, তাহাই অধিকরণ-সিদ্ধান্ত; Premise এবং অধিষ্ঠান-স্থল, এ দুয়ের শব্দার্থও অনেকাংশে সমান। নব্য কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের অনেকে Conclusion এই অর্থ সিদ্ধান্ত-শব্দের স্কন্ধে আরোপ করিয়া থাকেন,—গৌতম-সূত্র-ভাষ্যের নিম্নলিখিত বচন-টি দেখিলে তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে, যথা,—"অস্তি অয়ং ইতি অনুজ্ঞায়মানোঽর্থঃ সিদ্ধান্তঃ" অর্থাৎ, অস্তি বলিয়া যাহা অনুজ্ঞাত হয় তাহাই সিদ্ধান্ত; ইংরাজিতে ইহাকে Judgement অথবা Proposition বলে; যে সিদ্ধান্তের উপর অন্য সিদ্ধান্ত নির্ভর করে তাহাই অধিকরণ-সিদ্ধান্ত—Premise। যে সিদ্ধান্ত রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা পরিপুষ্ট তাহার ইংরাজি নাম Theory, যে সিদ্ধান্ত ঐরূপ প্রমাণ দ্বারা পরিপোষিতব্য তাহার ইংরাজি নাম Hypothesis।

পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একজন বিচক্ষণ ও ধার্ম্মিক। শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের মধ্যাবস্থায় যতগুলি শিষ্য হয় তন্মধ্যে কেশবচন্দ্রের ন্যায় পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণও একজন গণনীয় এবং জ্ঞান ও যোগ-মার্গে একজন অগ্রসর। সুতরাং তাঁহার কথা লইয়া আলোচনা করা আমরা কোন অংশেই নিরর্থক বিবেচনা করি না। তাঁহার সাধারণ সমাজের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগের প্রধান কারণ ধর্ম্মপ্রচারের প্রণালীগত প্রভেদ। আমরা তাঁহার একখানি পত্র যথাস্থানে প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে তাঁহার প্রচারপ্রণালী কতদূর সঙ্গত ইহা প্রদর্শন করা আবশ্যক হইতেছে।

বর্ত্তমানে পৃথিবী নানারূপ উপধর্ম্মে দূষিত। কি হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান সকল সমাজেই উপধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। জীবজগতের নিয়ম এই যে,যাহা যোগ্যতর তাহাই জীবিত থাকে, আর সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। ধর্ম্মজগতেরও ঠিক ঐ নিয়ম। যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন এইটী তাঁহাদের বেশ বোধগম্য হইবে। বেদে দৃষ্ট হয় এক এক বৈদিক কবির হৃদয় অল্পে অল্পে জড়রাশির আবরণ ভেদ করিবার চেষ্টা পাইতেছে, অল্পে অল্পে অনন্তের দিকে উন্মেষিত হইতেছে এবং পরিশেষে সহজ শক্তিতে উহা অনন্তে পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে। এই টুকু দেখিলে বোধ হয় যে, যে যোগ্যতর সেই জীবত থাকে জগতে কোন কালেই এই নিয়মের ব্যভিচার নাই। এস্থলে বুঝ, যাহার বল অধিক অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাই জীবিত। অপরগুলি কবিতারাশির সমাধি-স্তূপে মৃত ও শায়িত থাকিয়া লোকের অতীতের ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিতেছে। উপরে যেরূপ প্রদর্শন করিলাম এইরূপ নিয়মের বলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তি। ইহা অল্পে অল্পে সর্ব্বব্যাপী উপধর্ম্মের বক্ষ ভেদ করিয়া অনন্তের দিকে বিকসিত হইয়াছে। ইহাই এই ধর্ম্মের স্বাভাবিক উন্নতি বা বৃদ্ধি। যে ব্রাহ্ম সত্যকাম স্বধর্ম্মের এই ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন কি উপায়ে ইহা রক্ষিত হইতে পারে। এস্থলে, স্পষ্ট কথায় এবং এক কথায় এই মাত্র বলা যায় যে, যে শিশু একবার মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে পুনঃপ্রবেশ তাহার মহাবিনাশ। সুতরাং যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম পুনর্ব্বার উপধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা ব্রাহ্মের প্রথম কর্ত্তব্য।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও কিছু কর্ত্তব্য আছে। তিনি যে সত্যটী পাইবেন অবিকল তাহাই প্রচার করিবেন। বিকৃত আকারে প্রচার করা বিশেষ অনিষ্টকর। এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। জ্ঞান ও ভাব লইয়া ধর্ম্ম। মনে কর, বেদ যে ধর্ম্ম প্রসব করিয়াছে দর্শন তাহার জ্ঞান আর পুরাণ তাহার ভাব বা কবিতা। প্রচারের পক্ষে ধর্ম্মের এই দুই অঙ্গই বিশেষ উপযোগী। কিন্তু এদেশে এই কবিতা কিছু অনর্থের মূল হইয়াছে। আমরা ইহা অবশ্য স্বীকার করি যে, বিশুদ্ধ সত্য প্রচার করা দর্শনের ন্যায় পুরাণেরও উদ্দেশ্য কিন্তু কবিকল্পনা অজ্ঞাতসারে তাহার মূলে আঘাত করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ ছদ্মবেশে সত্য প্রচার। এদেশে যে দেবদেবীর এত বাহুল্য ইহার কারণই এই ছদ্মবেশী সত্য। প্রাচীনতম বেদেই তাহার মূল প্রোথিত আছে। কিন্তু দর্শন বেদ হইতে যে অবিমিশ্র সত্য প্রচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছে পুরাণ ঠিক সেরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইহা হয় তাঁহার ভ্রান্তি, নয় ছদ্মবেশে সত্যপ্রচার তৎকালে একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু আমাদের স-

নেক স্থলে রোগটাই বলবৎ মনে হয়। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি।

বেদের কাল ভারতের অতি শৈশব কাল। কিন্তু পৌরাণিক কালকে যৌবন বা বার্দ্ধক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দেখ সেই সময়ে কি হইয়াছিল। আমরা জগৎকার্য্যে যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিয়া থাকি বেদের কাল তাহা কিছুই বুঝিত না। বায়ু বহিতেছে, সূর্য্য উঠিতেছে, স্রোত খরবেগে চলিয়াছে, এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আদি কবিরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেন এবং নিজের কর্ত্তৃত্ব-সাদৃশ্যে প্রত্যেক ঘটনায় এক সচেতন অধিষ্ঠাতার কল্পনা করিতেন। এই সকল ঘটনার মধ্যে কতকগুলি মঙ্গলকর আবার কতকগুলি অমঙ্গলকর। যাহা মঙ্গলকর উহাঁদের চক্ষে তাহাই দেবতা আর যাহা অমঙ্গলকর তাহাই অসুর। মেঘ আত্মরক্ষার উপায় সূর্য্য বা ইন্দ্রের আলোককে আবরণ করিত সুতরাং তাহা অমঙ্গলকর এজন্য তাহার নাম বৃত্রাসুর। এই সূত্রটুকু ধরিয়া পৌরাণিক কবিরা দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের একটা ঘোরতর যুদ্ধ বর্ণনা করিলেন। বর্ণনার ঘটায় বোধ হয় যেন ইহা একটা বাস্তব ঘটনা। আর একটী স্থল দেখ। প্রভাতে সূর্য্য উদিত,তাহার স্বর্ণবর্ণ কিরণ প্রাভাতিক বায়ুবেগে আন্দোলিত বৃক্ষপত্র সকল স্পর্শ করিতেছে। এই দেখিয়া কবি কল্পনাবলে কিরণকে কর স্থানীয় করিয়া সূর্য্যকে হিরণ্যপাণি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে এই সূর্য্যই হিরণ্যপাণি অর্থাৎ বহু-সুবর্ণ-দ বলিয়া যজমান কর্ত্তৃক স্তুত হয়। আরও একটী দেখাই। বেদে সূর্য্য বিষ্ণু-নামে অভিহিত হইয়াছে। এই বিষ্ণুর বিষয়ে কথিত আছে যে, তিনি পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও আকাশ এই তিন স্থলে তিন পদ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন*। এই সূত্রটুকু ধরিয়া পৌরাণিক কবিরা বামন অবতার সৃষ্টি করিলেন। ঋষিরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রথমাবস্থায় কবিত্বের আকারে যে সকল সরল কথা বলিয়া যান অগ্রে কে ভাবিয়াছিল যে ভবিষ্যতে তাহার এইরূপ পরিণাম হইবে। ফলত পৌরাণিক দেবতত্ত্বের অধিকাংশেরই মূল এই ছদ্মবেশী সত্য। এস্থলে অনেকে বলিবেন বৈদিক কবিরা প্রাকৃতিক ঘটনা দৃষ্টে প্রাণিব্যবহারের সাদৃশ্য পাইয়া কল্পনায় যে সকল সরল কথা বলিয়া ছিলেন তাহাতে পৌরাণিক কবিদিগের বাস্তবিকই ভ্রম হইয়াছিল। এই ভ্রম হইতেই পুরাণে নানারূপ দেবতার সৃষ্টি হয়। ভালই, এরূপ স্থলে কেহ ভ্রম বলিতে চান বলুন কিন্তু আমরা তাহা বলি না। অতি প্রাচীন কালে কুমারিল্ল ভট্টের সহিত বৌদ্ধদিগের বিচার হয়। বৌদ্ধেরা দেবদ্বেষী। তাহারা কহিয়াছিল যে ব্রহ্মা কন্যাগামী, তাঁহার পূজা কিরূপে করা যায়। প্রত্যুত্তরে কুমারিল্ল ভট্ট কহিয়াছিলেন ব্রহ্মার পক্ষে এ ঘটনা বাস্তব নয়। কারণ সূর্য্যের অপর নাম ব্রহ্মা বা প্রজাপতি। অরুণোদয়কালে তাঁহার আগমনে উষার জন্ম। এই জন্যই উষা তাঁহার দুহিতা। উষার সহিত তাঁহার তেজ সংযোগ হয় বলিয়া ঐ উভয়ে স্ত্রীপুরুষবৎ উপচরিত হইয়াছে†। ঘটনা বাস্তব নয় ইহা কবিকল্পনা মাত্র। এখন এই স্পষ্ট কথাটী আলোচনা করিলে এবং পুরাণের লিখনভঙ্গী পরীক্ষা করিলে বোধ হয় ছদ্মবেশে সত্যপ্রচার তখনকার একটা রোগ ছিল। ইহা রোগ বা যাই হউক কিন্তু আমরা বলি সত্যের অঙ্গে এই-রূপ অলঙ্কার বড় বিপদাবহ। এইরূপ প্রচ্ছন্ন

* ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।

† প্রজাপতিস্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যতে। স চারুণোদয়বেলায়ামুষস্যাদায়ন্ত্যেতি সা তদাগমনাদেবোপজায়ত ইতি তদ্দুহিতৃত্বেন ব্যপদিশ্যতে। তস্যাং অরুণ কিরণাখ্য বীজনিক্ষেপাৎ স্ত্রীপুরুষ সংযোগবদুপচারঃ।